গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
কামিনী প্রকাশনী
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
নারায়ণ দেবনাথ

অলংকরণে
বাবলু বর্ম্মণ

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৯১

মূল্য—দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী
অবলা প্রেস
১/এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

আমার প্রিয় কিশোর কিশোরীরা,
আমার খেয়ালী মামা আর আমুদে
দাদুর সঙ্গে তোমাদের অনেক দিনের
পরিচয়। এঁরা কেউই গল্পের চরিত্র নয়।
সত্যিই আছেন। আর প্রতি মুহূর্তে তোমাদের
জন্যে গল্প তৈরী করছেন। এমন মজার
মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেলে সব
গল্প যে শেষ হয়ে যাবে। আমার
সঙ্গে তোমরাও প্রার্থনা কর এই গোলমালের
পৃথিবীতে তাঁরা যেন আরও কিছুকাল জীবিত
থাকেন। আমি বলি, ওঁদের আগেই আমি
যেন যেতে পারি। তা না হলে আমার ভীষণ
দুঃখ হবে।

তোমরা আমার ভালবাসা নাও।

ইতি—

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ—

শ্রীদুলাল চন্দ্র শীল

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

—সূচীপত্র—

	পৃ:
সুখে থাকতে ভূতে কিলনো	৫
ভুঁড়ির বিপত্তি	২৩
গোলেমালে হরিবোল	২৮
দাদুর দাদানো দাঁত	৪৯
দাদুর ইঁদুর	৫৮
দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর	৬৩
বড়মামার দাঁত	৭০
বড়মামার মিনেজারী	৮৩
বড়মামার সাইকেল	৯৬
মাছ ধরলেন বড়মামা	১১৫
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	১২২

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের কিছু বই-

শার্লক হোমস কিশোর অমনিবাস—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

কিরিটীর রহস্য গোয়েন্দা ডায়েরী – নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ম্যাজিসিয়ান মামা – সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পাখী থেকে হাতী—আশাপূর্ণা দেবী

গল্পের চকমকি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অপুর কথা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের আরব্য রজনী—সুজিত কুমার নাগ

দম ফাটানো হাসির গল্প –শিবরাম চক্রবর্তী

অলৌকিক বিভীষিকা— হেমেন্দ্র কুমার রায়

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প –সুকুমার রায়

বাঁদরের ডাক্তারি –কান্তি পি. দত্ত

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

মেজমামার বাঁ হাতে একটা বই ডান হাতে ঝোলে ডোবান রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান সমুদ্র, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন। সব সময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন,

'কি করে বুঝলে! তোমার কান দুটো অবশ্য একটু বড়ই, ঝোলা, ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় হয় না। প্রকৃতির ব্যাপার। বোঝা শক্ত। কে যে কি ভাবে জন্মায়! চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু এক ফোঁটা পড়েছে। দৃকপাত নেই। জ্ঞানতপস্বী।

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষে না। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে।

মাসীমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা! গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সব সময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে

'বিশ্বামি ?'

'হ্যাঁ। স্বরসন্ধি। আকারের পর আকার থাকিলে উভয় মিলিয়া দীর্ঘাকার হয়। এখুনি জিগ্যেস করবি দীর্ঘাকার কি ?

দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বর সন্ধি!'

'মেজ মামাকে এখুনি বলে আসব ?'

'শিওর! নাকের ডগায় রাসেল নিয়ে বসে আছে বার্ট্রাণ্ড বানান জানে না।' যাক বাবা ? বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজ মামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা, বড়মামাকে ঘরে পেলুমনা। অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টক টকে সিল্কের লুঙ্গি। খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙ্গুলে জায়গা নেই। আংটি কোমরের কাছে ঝুলছে। চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছটা কুকুর ঘরময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালা করে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিসকুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, 'উঁহুঁ উহুঁ সবকটাই তোর দুটো হয়ে গেছে এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে ঘাড়ে ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝেমাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'এইবার সবকটাকে দূর করে দোব। ইনডিসিপ্লিন্ড জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে কপালে ঠেকাচ্ছেন।

কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য! ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি! প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানালায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কি হল কে জানে ? হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন, 'বুঝলি এইখানেই হবে।'

'কি হবে বড়মামা ? নারকোল গাছ ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা ?'

'তবে ?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। ওই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট। দুটোর মধ্যে যারাযারা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার ?'

'তবে না ত কি ? দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ভেজিটেবল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই কুকুরগুলো মুখিয়েছিল ; সকালের বিসকুট পায়নি। চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে। একটা পেছনের দিকে পিঠের ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে। একটা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'উঃ পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিসকুট পর্ব শেষ হতে না হতেই মাসীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব কটা কুকুরকে একজায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা ! কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিসকুট দিয়ে ব্রেকফাষ্ট করছে। উৎপাতের ধন এই ভাবেই চিৎপাত যায় !'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসীমা ভীষণ অবাক হলেন,

'অ্যাঁ ভূতের মুখে রাম নাম।'

বড়মামা চায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ ! জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। প্রথমে পঁচিশজন দিয়ে শুরু ধীরে ধীরে একশো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর ! অত কুকুর পাবে কোথায় ?'

'গবেট! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্র নারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি? বারোয়ারী পূজো প্যাণ্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ণ সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেণ্ট হলে নাকি?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রী কিচেন, জাষ্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেলপ্যালেস। আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরির হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মশলা, তেজপাতা। তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড? গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কি রে! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেণ্ড বস তো। তোর পরামর্শে হিসেবটা সেরে নি। ধর পঁচিশজন।'

মাসীমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা! তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জনমিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন বালাই ষাট। নে, বল, পঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয়, ফুলভরা।'

মাসীমা বললেন, 'পঁচিশ কেজি!'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, 'নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল, পঁচিশ পো, মিনস ওই ছ সের। মিনস ব্ল্যাকে কিনলে আঠার টাকা। এইবার ডাল। ছ সের চালে কত ডাল লাগেরে? ফর্মুলাটা কি?'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ্ ভাঙচি দিচ্ছিস, হাফ ডাল। হাফ মিনস তিন কেজি, পনের

টাকা। আঠার প্লাস পনের ইজিকল্টু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং, নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামার সে কি উৎসাহ! তড়াং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মাসীমা বললেন,

'ভাগনে কি ভাবে লেগে পড়বে?'

'যে ভাবে লাগাব সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ?'

'সে ত বুঝলুম, কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ও কি ঘোড়া ধরতে বেরোবে!'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস! আটচালা তৈরি। রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল ডাল কেনা। তারপর প্রচার।'

'প্রচার মানে?'

'প্রচার মানে?' বড় মামা রেগে গেলেন! 'প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কি করে? না জানতে পারলে লোক আসবে কি করে!'

'অ। তা সেটা কি ভাবে হবে! কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোষ্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড! কোনটা!'

'ভ্যাক্। ওর কোনটাতেই কাজ হবে না! দুস্থ মানুষ যারা পড়তে জানেনা, যাদের পয়সা নেই সিনেমা দেখেনা, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটের লিষ্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরিব মানুষ খুঁজে বের করে হাত জোড় করে সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে, দয়া করে এই অধমের গরিবখানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।'

মাসীমা বললেন, 'ডাক্তারি তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না, ইডিয়েট। যা আর এক কাপ

চা করে আন। বেরিয়ে পড়ি। তোদের মত আলস্যযোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দোবনা। কর্মযোগ। কর্মযোগ! যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল। গীতা পড়েছিস গবেট!' মাসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়মামা প্যাণ্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসীমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণ পাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা।

'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে!

'রাগলে তোমার আর কি? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এই সব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হুঁ ইজ মেজদা। তার দর্শনে জীবে দয়া নেই জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা তুই যা, আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

মাসীমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি বললুম,

'বড়মামা, হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পত পত করে।'

মটরসাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।'

বড়মামার মটর সাইকেল তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম ঢ্যাং রোডে পড়ে,

শরৎচন্দ্র ষ্ট্রীট হয়ে, কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নসত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায়ে লেখা থাকবে' 'শক, হুন, দল, মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।'

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলে মেয়ে পৌঁছাতে। কেউ অফিসে। চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জম জমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে কাগজ ডাঁই করে হকার চলেছেন বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছেনা যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, 'দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জটপাকান চুল, গর্তে বসা চোখ, শির বের করা হাত, সামনে কুজো হয়ে ধুকতে ধুকতে চলেছে, কিম্বা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড় বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলেই বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছ তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন,

'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখেছিস! গরিবী হটাও ত সত্যিই গরিবী হাটাও, সবাই ওয়েল-টু-ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিলফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে সব বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

'আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না।' কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছব তলায়, শ্মশানে পাকুড়তলায় বাঁধান চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিস নি! উঠতেই যদি পারবে তা হলে ত খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ব্যারিষ্টার হবি। চল তা হলে মোচ্ছব তলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মটর সাইকেল ষ্টার্ট করলেন। ভু, ভটভট শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইটের গোলা, খড়ের গোলা, বাঁশের গোলা, খড়কাটা কল চলছে ঘসঘস করে।

মোচ্ছব তলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটি লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে ঘোলাটে চোখ। শীর্ণ শীর্ণ হাত পা! ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ।'

'দেখেছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস।' বড়মামা গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটির কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। কে তো কে। জগতে কোনও কিছুর পরোয়া করেনা। এই রকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোচ্ছবতলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কি করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ত নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট ত খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশার আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়মামার কাছে আছে। পকেটে থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কি? কেউ মরেচে নাকি?

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

'আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই ত, কেউ মরেচে, দুখী বোষ্টুম চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'না না ওসব নয়, ওসব নয়। অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে?' কি খেতে? শ্রাদ্ধ!'

'না না শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি?'

'কোন আশ্রম! আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা। অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারব না। ধম্মে সইবে না।

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

'কার পাচিত্তির! কি অসুখ!'

'পাচিত্তির মানে? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না-না প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাষ্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কি করে দিতে হবে? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাঠ কাটা, খড় কাটা!'

'কিচ্ছুনা কিচ্ছুনা, ওসব কিচ্ছুনা। রোজ একটা নাগাদ যাবেন, খাবেন দাবেন, চলে আসবেন।'

'কি খাওয়া!'

'খিচুড়ি, ভাজাটাজা এই আর কি।'

'কি ডাল? মুসুর ডাল চলবে না। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কি চাল? আলো না সেদ্ধ।'

'ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবাদেরই চলে। রেশনের কাঁইবিচি চাল, না বাজারের চাল?

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেস্ট হয় না।'

'হ্যাঁ তা পড়বে।

'শালপাতায়, না কলাপাতায়, না চটা ওঠা এনামেলের থালায়!

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কি করে? বোষ্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হ্যাঁ একটা কথা বোস্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে না আমি একলা!'

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন, 'সাত জন? বলে কি? এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। না না, একা নয় এক নয়। সপরিবারে।'

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে?

'আজ হল গিয়া রোববার। সোম, মঙ্গল; বুধ। হ্যাঁ বুধ ভাল বার।

'প্রভুর নিবাস?'

বাব্বা, বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন। মেজমামা একবার শুনলে হয়। জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটা বললে, 'অ,

আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার। বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল, 'ছিটেল বললেন!

'ছিটেলকে ছিটেল বলব না! সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালী।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেছি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের! উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধম্ম কম্ম করে। সারা জীবনের অধম্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভীড়! সব ওই ভেজালদার কালোবাজারী, ডাক্তার, উকিল, এম এল এ, মন্ত্রী।'

ভেট্ ভেট্ করে মটর বাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন, 'কি রকম ট্যাঁকট্যাঁকে কথা শুনেছিস! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যাণ্ড লাফ, তা না অ্যায়সা রাগ ধরছিল। যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত সাতটা লোক পাওয়া! বাকি রইল আঠারটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারের নাম সতুবাবু। ভার দেওয়া হল আরও আঠার জন সংগ্রহ করার। 'পারবেন ত!'

'হ্যাঃ' সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠার কেন, আঠারশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোকলস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়নের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিষ্কার করবে বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসীমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, চা দে কুসী চাল নে, সব ভাত খাবে।

হই, হই ব্যাপার।

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন, 'কি সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য!'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে খাবার সময় চিৎকার করে বলবে, জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক! তোমার বড় মামা কি নাম পালটে ফেললে নাকি! নাম ভাঙিয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি! আসলে বলবে, জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা! কোথাকার রাজা? কাম্পুচিয়ার! ওই টাইমটেবলটা এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড় বিড় করে পড়তে লাগলেন, 'আট নম্বর প্লাটফর্ম, রাত নটা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা!'

'যেদিকে দুচোখ যায়।'

'সে কি?

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি? অসৎ কাজ?

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন নেও সামলাতে পুলিস ডাকতে হবে।

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কি বলছিলরে?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কাম্পুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ!' বড়মামা হই হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারাজীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারল না, আমি এক কথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন সুধাংশু? আরে সেই ডকটর সুধাংশু, গরিবের মা বাপ।'

'মেজমামা ত রাত নটা চল্লিশের ট্রেনে যে দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই না কি ? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা।'

বড়মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল ?'

'আ গিয়া।

'ডাল ?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহুত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যাল ফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। মানে, এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব ক্ষেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের উষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পূজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর ঝুলুর করে। কাগজের রঙীন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যাম জেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন। বড়মামা মাসীমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়িতে খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সঙ্গমে স্নান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দোব—।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই ধেই করে নাচব। মাসীমা রেগে চলে গেলেন। মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসীমাকে চিৎকার করে বলে 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত নটা চল্লিশে।

ওদিকে বেলতলায় শ্যাম জেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি' ধনং দেহি, যশো দেহি। জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে

বললেন, 'সেই সাত সকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতা কর্ণ!'

ছটা কুকুর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা অচেনা লোক দেখছে ততই ঘেউ ঘেউ করছে। মাসীমা গ্লিসারিনে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারা গাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঢ্যাং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে—শুরু হল। সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দু হাতে একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঢ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হই হই করে। সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি। বোষ্টম, বোষ্টমী, গেঁড়ি গেঁড়ি ছেলে মেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবকটাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। 'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি', শ্যাম জেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।

ফোলডিং চেয়ার উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ায় ঠ্যাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই পড়ে গেছেরে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসীগাছ কোন দিকে?'

'তুলসীগাছ কি হবে গো?' ভজুয়া জিজ্ঞেস করল।

'দূর বেটা খোট্টা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়!' বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁক।

পঁচিশ কোথায়? পিল পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে? হাড়ি

নয়, ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেম। অ্যানাউনস করেছে, পঁচিশ জনের বেশি নয়। গেটটা বন্ধ করে দে রাশকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকান যাবে না ডাগদারবাবু? গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাককা মেরে বের করে দে।'

মেরে শেষ করে দেবে বাঁবু।'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন,' শুনুন শুনুন আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্যে।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশ জনের একজন।

'তা কি করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটের প্যান্টশার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।'

'চিৎকার উঠল 'আমরা মডার্ণ গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মর্ডান গরিব বেছে নেব।'

'বেছে নেব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কি রে বাবা এরা যে দেখছি তেড়িয়া হয়ে উঠছে বেশ জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশজন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই, হই, রই, রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে। যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউন্টার খোলা হয়েছে। ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে, 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জুলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যামজেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু প্রাণে যদি বাঁচতে চাও পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি। ব্যাপারটা বুফে লাঞ্চের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে খাক।'

চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে।

একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মটরবাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে।

মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন।

'হ্যালো থানা। নরনারণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থান ইট ছুঁড়ছে। ও সেভ আস সেভ আস।'

ছটা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা দেয়াশলাই কাঠি যতই খোঁচাখুঁচি করছেন গ্লিসারিন-তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে! শিলা-বৃষ্টি হচ্ছে না কি রে!'

'আর দাঁড়াতে পারছিনা। আমার পা কাঁপছে। প্যাণ্ডিমোনিয়াম! আরে দূর মশাই হারমোনিয়াম নয় প্যাণ্ডিমোনিয়াম!'

আমি তখন দেওঘরে এক বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করি। শীত প্রায় আসবো আসবো করছে। সকাল সন্ধ্যে হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডার কামড়। শিক্ষক ছাত্র এখানকার নিয়ম অনুসারে সকলেই সকলকে দাদা সম্বোধন করে থাকেন। রবিবার। দুপুরে বেশ ভুরিভোজ হয়েছে। 'এইবার একটু গড়াগড়ি দিতে পারলেই হয়। এমন সময় একটা টাঙ্গা রোদ ঝলমলে মাঠ পেরিয়ে আমাদের শিক্ষকাবাসের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীত শিক্ষক তুলসীদা লম্বা ছিপ-ছিপে গৌরবর্ণ মানুষ একেবারে ধোপ-দুরস্ত হয়ে এসে আমাদের ঘাড় ধরেই প্রায় বিছানা থেকে তুলে দিলেন। আজ একুট দর্শন করতেই হবে।

তুলসীদার কৃপায় আজ আমরা একুট যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে টিচার বিদ্যুৎদা আর ইংরেজী শিক্ষক সুধাংশুদা সমবয়সী। আমাদের দুজনের চেয়ে বয়সে বড়। তুলসীদার গলায় মাফলার। গাইয়েদের গলার অদৃশ্য শত্রু অনেক। বারোমাসেই মাফলার দিয়ে প্যাক করে রাখতে হয়। নাদ ব্রহ্ম। তিনি নাভির কাছ থেকে বায়ু পিত্ত কফ ভেদ করে উঠে আসেন কণ্ঠে। তুলসীদার ডেলিডায়েটে স্টার্চ কম, প্রোটীন বেশী, এক কেজি বিদ্যাপীঠের বাগানের পেপে, দুটো মাঝারি সাইজের পেয়ারা আর সকালে আধ হাত নিম দাঁতন কমপালসারি। চেহারাটি একেবারে কঞ্চিকা মাফিক। বিদ্যুৎদা বারবেল সাধেন। বাইসেপ, ট্রাইসেপ,

ডেলটয়েড সবই বেশ খেলে। খেলে না কেবল কোলোন। ইসবগুল দু কেজি পালঙের সুরুষ সবই ফেল করেছে। মাংসের যুসটি খান মাংস ফেলে দিন এই তাঁর উপদেশ। দুশ্চিন্তা একটাই চুলে সাদা ছিট ধরছে আর উঠে যাচ্ছে। অন্যথায় স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। সুধাংশুদার সমস্যা একটাই। ভুঁড়িটা আর কত বাড়তে পারে তিনি দেখতে চান। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতই উদার। বিদ্যুৎদার মতে এই উদারতা সব উদরে গিয়ে জমছে। সুধাংশুদার মস্তবড় গুণ ধীর স্থির মেজাজটি অদ্ভুত ঠাণ্ডা এবং বেশীক্ষণ তিনি জেগে থাকতে পারেন না। এই তো কোলের উপর ভুঁড়িটি নিয়ে আয়েস করে বসে আছেন। মুদিত নয়ন! নাসিকায় গর্জন। আমাদের রসিকতা তাঁর শরীরের চর্বির স্তর ভেদ করতেই পারে না। তুলসীদা নাকি ৬৫ সালে একটা গণ্ডারকে সুরসুরি দিয়েছিলেন, রিপোর্ট সেটা ৬৭ সালে হেসে উঠেছিল।

তিনটে নাগাদ আমরা একুটের পাদদেশে। তুলসীদার ফ্লাস্কে চা। এক চুমুক করে হল। সুধাংশুদা ঘাড় বেঁকিয়ে পাহাড়ের মাথাটা একবার দেখবার চেষ্টা করে বললেন—ইমপসিবল, ওনলি এ গোট ক্যান ক্লাইম্ব দিস হিল। তুলসীদা বললেন—রাখুন মশাই আপনার ইঞ্জিরি। ভাষাটা জানি না বলে যা খুশি তাই গালাগাল দেবেন। বিদ্যুৎদা বললেন, বিদ্যাপীঠের ডাক্তারবাবু কি বলেছেন মনে নেই? পূর্ণকুম্ভের মত আপনি এখন পূর্ণগর্ভ। আরোহন এবং অবরোহন আপনার একমাত্র ওষুধ। ওসব চালাকি চলবে না। চলুন।

সুধাংশুদার প্রতিবাদ, কাকুতি মিনতি, কে শুনবে। পর্বতশীর্ষে সুধাংশুদাকে আমরা ভোলানাথের মত প্রতিষ্ঠিত করবই। প্রতিজ্ঞা ইজ প্রতিজ্ঞা।

ত্রিকুট খুব সহজ পাহাড় নয়। উঠতে গিয়েই মালুম হল। কাঁকরে পা স্লিপ করে। আঁকড়ে ধরার মত কিছুই নেই, একমাত্র নিজের প্রাণটি ছাড়া! পাশেই খাদ। পড়লে চিরশান্তি। পাহাড়েই প্রেতাত্মা হয়ে আটকে থাকতে হবে। ভ্যানগার্ড তুলসীদা রিয়ার গার্ড বিদ্যুৎদা মাঝে আমি আর সুধাশুদা। সুধাংশুদা বললেন, এই প্রথম বুঝলুম

ভুঁড়ির ওজন কত। বেশ ভারি মশাই। আগে ভাবতুম মাস উইদাউট ওয়েট, এখন দেখছি উইথ ওয়েট।

একটা চাতাল মত জায়গা পাওয়া গেল। একটু বসে, বাকি চাটা শেষ করতে হয়। একটু প্রকৃতি দর্শন না করলে পর্বতপ্রেম আসে কি করে। সুধাংশুদা বললেন, 'ভাই আমার উপর আর টর্চার কোরো না, তোমরা আমার ছেলের মত। আমি এখানে বসি ; তোমরা নামার সময় আমাকে নিয়ে যেও। একটা রফা হল। আর একটু উঠলেই রাবন গুহা দর্শন করে আমরা নেমে যাবো। আরে মশাই শরীর আগে না মাইথোলজি. আগে। রাবনের রেলিকস না দেখে চলে যাবেন ? তুলসীদার অনুপ্রেরণায় হাতের ওপর ভর দিয়ে সুধাংশুদা শরীরকে ওঠালেন।

গুহা দেখলেই ভয় ভয় করে। গুহার অন্তর্নিহিত সত্য সহজে জানা যায় না। কি যে মাল লশলা ঘাপটি মেরে ভেতরে বসে আছে। একমাত্র ঋষিরাই বলতে পারেন। মুখটা বিশাল। দুদিকে পাথরের দেয়াল। একটু যেন টেপারিং হয়ে গেছে। আমাদের কনভয়ের সেই আগের অর্ডার। প্রথমে তুলসীদা, পাথ ফাইণ্ডার হাতে টর্চ। নেকসট সুধাংশুদা। তারপর আমি। তারপর বিদ্যুৎদা। তুলসীদা বললেন, 'ব্যাঘ্র যদি থাকে আগে আমাকে খাবে। সুধাংশুদা বললেন, এ্যাম নট শিওর। খাদ্যের ব্যাপারে ওরা ভীষণ সিলেকটিভ। বোনস ওরা চিবোয় ঠিকই তবে ফ্রেশটাই আগে চায়। কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছি। এইবার সেই জায়গাটা দুই পাথরের দেয়াল চেপে এসেচে, তুলসীদা কাত হয়ে এগিয়ে গেলেন। সুধাংশুদা তাই করলেন। কেবল একটু মিস ক্যালকুলেসান। এ কি হল ?' সুধাংশুদার গলা। আর তো যাচ্ছে না, মরেছে। কি যাচছে না। আমরা এপাশের দজন সমস্যাটা বুঝতেই পারিনি। সুধাংশুদা বললেন, আমি যাচছিনা। দাঁড়িয়ে থাকলে যাবেন কি করে ? চলার চেষ্টা করুন। সুধাংশুদা বললেন প্রায়কাঁদো কাঁদো, ভুঁড়িটা আটকে গেছে ভাইসের মত।' আমরা চিৎকার করলুম তুলসীদা। দূর থেকে উত্তর এল ! সুধাংশুদার ভুঁড়ি আটকে গেছে।

শেওলা ধরা দেয়াল। ভুঁড়ি তার গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবির

কভার নিয়ে দুটো পাথরের মাঝখানে জম্পেশ। প্রথমে কিছুক্ষণ কমন-সেনসের খেলা চলল—নিঃশ্বাস খালি করে পেট কমান। দেখা গেল এ পেট সে পেট নয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাড়া কমার কোনো সম্পর্কই নেই। সন্ধ্যের মুখে আবার উদরে বায়ুর সঞ্চার হয়। আপনার নিজের পেট নিজের কণ্ট্রোলে নেই। একটু নামাতে পারছে না। তুলসীদা সুধাংশুদা অক্ষমতায় খুব অসন্তুষ্ট। কি করি বলুন কমছে না যে?' সুধাংশুদার হেল্পলেস। 'বিদ্যুৎ তোমরা ওদিক থেকে টেনে দেখো। আমিও এদিক থেকে ঠেলে দেখি। আউর থোরা হেইও, বয়লট ফাটে হেঁইও। এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। 'মোক্ষম আটকেছেন মশাই। কি করে আটকালেন। একেবারে নিরেট থাম। আপনি কি রাবনের চেয়ে দশাসই। অতবড় একটা রাক্ষস স্যাট স্যাট গলে যেতো। আর আপনি সামান্য একজন মানুষ আটকে গেলেন।'

রাবনের ফিজিওনসি নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা হল। সুধাংশুবাবু বললেন, তার মশাই নানারকম মায়া জানা ছিল। এই খানটায় এলে হয়তো মাছি হয়ে যেতো!' বিদ্যুৎদা বললেন 'খুব মশাই। তবু নিজের দোষ স্বীকার করবেন না। ব্যায়াম, ব্যায়াম। রাবন মুগুর ভাজতেন, পাঁচ হাজার ডন, দশ হাজার বৈঠক ডেলি। আর রাক্ষস হলেও রাক্ষুসে খাওয়া ছিল না আপনার মত। কোনো ছবিতে রাবনের ভুঁড়ি দেখেছেন। অন্য সময় হলে তর্কাতর্কি হত। বিপন্ন সুধাংশুদা, রাবনের উপর লেটেষ্ট রিসার্চ অম্লান বদনে মেনে নিলেন।

আচ্ছা এখন তাহলে কাতুকুতু দিয়ে দেখা যাক। নিন হাত তুলুন। প্রথমে বিদ্যুৎদা। কোথায় কি? খ্যাঁত খ্যাঁত করে হেসে উঠলে ভুঁড়িটা হয়তো ধড়ফড় করে উঠতো, সেই সময় মোক্ষম ঠ্যালা। আমি বললুম দাঁড়ান, ওভাবে ডিরেকট কাতুকুতুতে হবে না। টেকনিক আছে। দেখি হাতের তালুটা। এই নিন, ভাত দি, ডাল দি, তরকারি দি, মাছ দি, নিন মুঠো করুন, মুক্তো খুলুন, যাঃ, কে খেয়ে গেল অ্যাঁ, ধর মিনিকে, ধর মিনিকে, কুতু কুতু। কোথায় হাসি? না মশাই হবে না। আপনি এখানেই থাকুন ফসিল হয়ে। অপঘাতে মৃত্যু লেখা আছে, কে খণ্ডাবে।'

তুলসীদা বললেন, আহা আমি কি শুনাব সতী-সাধ্বী স্ত্রী, যে সহমরনে যাবো? এই মালকে ক্লিয়ার না করলে এদিকে তো ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে।' 'আপনি হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসুন।' কাপড়ে শ্যাওলা লেগে যাবে যে?' বিদ্যুৎদা বললেন, 'জীবন আগে না কাপড় আগে' তুলসীদা অবশেষে হামা দিয়ে চলে এলেন আমাদের দিকে।

'বসার চেষ্টা করে দেখুন তো।' সুধাংশুদাকে যা বলা হচ্ছে, প্রাণের দায়ে তাই তিনি বাধ্য ছেলের মত করছেন। বসার চেষ্টা করলেন, হল না। অমরা বললুম, একটু জলত্যাগ করুন তো, যদি পেটটা কমে, না, মরে গেলেও তিনি এই কাজটি করতে রাজি হলেন না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তুলসীদা বললেন, টাঙ্গাওলা চলে গেলে ফেরার দফা রফা। টর্চ জ্বেলে তুলসীদা একবার ভুড়িটা ইনস্পেকসান করে বললেন, বিদ্যুৎ এদিকে এস। ছুড়ি আছে?' আমার পকেটে ছুরি ছিল। ছুরি কি হবে তুলসীদা? সুধাংশুদা প্রায় কেঁদে ফেলেন। আর কি। ওপোর থেকে একপোচ কেটে নেবো। সবটাই তো চর্বি লাগবে না। আপনার যা গ্রোথ দেখতে দেখতেই গজিয়ে যাবে।' তুলসীদা ছুরি দিয়ে পাশ থেকে গেঞ্জি আর পাঞ্জাবিটা ফালা করে ভুড়িটাকে খুলে দিলেন। ঠাণ্ডা লেগেছে। সুধাংশুদা একটু সিটিয়ে গেলেন। কাজ হয়েছে। তুলসীদা ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা চা ঢাললেন "জয় বাবা বদ্রী বিশালা। একটু লুব্রিকেট করে দিলুম। এবার মারো টান। আমরা চারজনেই জড়াজড়ি করে পড়লুম। সুধাংশুদার ভুঁড়ির ওপরে নুনছলে একটু উঠে গেছে। পাঞ্জাবীটা ছিড়ে বেরিয়ে গেছে। ভুঁড়িটা সম্পূর্ণ অনাবৃত। চা আর শ্যাওলার পেষ্ট মাখানো। বৃদ্ধ বয়সে গায়ে হলুদ।

টাঙ্গা যখন বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করল, রাত হয়ে গেছে। নামার আগে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সুধাংশুদার একটিই খালি কাতর মিনতি—'ভাই দয়া করে ছাত্রদের বোলো না। বৃদ্ধ বয়সে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।' তবু এমন ঘটনা চেষ্টা করলেও চেপে রাখা যায় না। রাষ্ট্র হয়ে পড়বেই।

———

"পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর উদ্যান, উদ্যান হল মানবের সৃষ্টি।"

"কোন নেতা আবার এই জ্ঞানটি দিলেন ?"

দাদুর মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। পায়ের ওপর পা। এক পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মৃদু-মৃদু নাচছে। উলটো দিকের সোফায় বসে আছেন মেজদাদু। থাকেন দেরাদুনে। অনেক দিন পরে কাল এসেছেন। ইচ্ছে, রিটায়ার করার সময় হয়েছে, দেরাদুনের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। মেজদাদুর স্বভাবই হল মানুষকে ভশকে দিয়ে মজা করা। মা দু'জনের সামনে দু'কাপ চা রেখে গেছেন। মেজদাদু দু'চার চুমুক চা চালিয়েছেন। বড়দাদু কাগজ থেকে মুখ তোলার অবসর পাচ্ছেন না। মাথা ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডানে টানা পাখার মতো ঘুরেই চলেছে।

বড়দাদু কাগজের আড়াল থেকে বললেন, "এ সব কথা নেতাদের বলার ক্ষমতা নেই। তাঁরা বলবেন, চলছে চলবে। এ হল আমার কথা।"

"হঠাৎ তোমার এই রকম একটা জ্ঞানোদয় হল কেন ?"

"পৃথিবী একটা পাঠশালা। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রতিমুহূর্তে মানুষ কিছু না-কিছু শিখতে পারে। আর তোর মতো চোখ বুজে

থাকলে পৃথিবী ঘুরেই যাবে, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে।"

"তুমি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না দাদা! কাগজ পড়তে-পড়তে পৃথিবী, ঈশ্বর, উদ্যান তিনটে একসঙ্গে এসে গেল কী ভাবে? দ্যাখো, কৌতূহল না থাকলে মানুষের জ্ঞানলাভ হয় না। শিশুদের কৌতূহল বেশি বলে তারা ঝটপট অনেক কিছু শিখে নিতে পারে।"

"তুমি যদি নিজেকে শিশু মনে করে থাকো, তা হলে আমার অবশ্য কিছুই বলার থাকে না।"

"আমি শিশু কি না নিজেই দ্যাখো। এই দ্যাখো আমার একটাও দাঁত নেই।"

মেজদাদুর দু'পাটি বাঁধানো দাঁত শোবার ঘরে এক গেলাস জলে এখনও ভিজছে।

বড়দাদু বললেন, "কাগজে আজ একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠে বাগানসহ বাড়ি বিক্রয়। তুই তো বলছিস দেরাদুনের পাট তুলে দিবি। এই বাগানবাড়িটা কিনে নিলে কেমন হয়?"

"উঃ ফাটাফাটি হয়ে যায়। ইউ আর গ্রেট দাদা। অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের মতো তুমি আমার দাদা দি গ্রেট। কাগজটা একবার দাও না।"

উত্তেজিত হোসনি। সাফল্যের মূলে থাকে ধৈর্য।"

মেজদাদু সোফায় এলিয়ে পড়ে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "তোমার চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

"যাক। চা আমি ঠাণ্ডা করেই খাই। গরম চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়।"

"আরে আমি তো চিরকালই গরমই খাই। তুমি তো আগে বলোনি। তাই আমার গায়ের রঙটা কেমন যেন মাজা-মাজা হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, এই নে তোর কাগজ।"

বড়দাদু কাগজটা মেঝেতে ফেলে দিলেন। মেজদাদু কাগজটা তুলে

নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কাগজও তো মা সরস্বতী। দেশবিদেশের কত খবর থাকে! আমাকে বললেন, "চশমাটা শোবার ঘর থেকে নিয়ে এসো তো। আমার দুটো চশমা, যেটার মাথা কাটা, সেটাকে বলে রীডিং গ্লাস. তুমি সেইটা আনবে।

বড়দাদু বললেন, "হাফ চশমাটা।"

শোবার ঘরের আলনায় গোটা কুড়ি বিভিন্ন ধরনের ছড়ি ঝুলছে। মুসৌরির পাহাড় থেকে মেজদাদু কিনে এনেছেন। বৃদ্ধদের উপহার দেবেন। বড়দাদুকে একটা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি এখনও বৃদ্ধ হইনি। এখনও আমি যুবক।"

চশমা চোখে দিয়ে মেজদাদু বিজ্ঞাপনটা জোরে জোরে পড়লেন।

"দাদা, একটা ফোন নম্বর রয়েছে। একবার ফোন করে দেখলে হয় না? শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্।"

"উঁহু ধৈর্য। চা শেষ করে আমি আবার একবার বিজ্ঞাপনটা পড়ব। দু'বার পড়ব, তিনবার পড়ব।"

"কেন? এটা কি তোমার পরীক্ষার পড়া? অতবার পড়ার মানে?"

"সে তুই বুঝবি না রে মানু! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে রে! ম্যাপ দেখে জায়গাটা চিনতে হবে।"

"কী যে বলো তুমি! সারা জীবন তিলকে তাল করে এলে। এ কি তোমার কুমেরু অভিযান নাকি যে, ম্যাপ দেখে জায়গা চিনতে হবে! চব্বিশ পরগনার আবার ম্যাপ কিসের!"

"সে তুমি বুঝবে না ছোকরা! থাকো বিদেশে। যুগ কীরকম পালটেছে সে খবর রাখো?"

"খুব রাখি।"

"অশ্বডিম্ব রাখো। সারা জীবন তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাটালে। বাঘ, ভাল্লুক, বন্দুক, পাইনগাছ, এই তো তোমার জগৎ।"

"কেন, কেন? সতীদাহ বন্ধ হয়ে গেছে, এ খবর আমি রাখি। জাতিভেদ-প্রথা উঠে গেছে. এ খবরও রাখি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা উঠে

গেছে, সে খবরও রাখি। দেশে দু'রকমের ইস্কুল আছে, ইংলিশ আর বেঙ্গলি মিডিয়াম।"

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে খবর রাখো?"

"তুমি কি আমাকে সত্যিই সদ্যোজাত শিশু ভাবলে? সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট, এ রেড লেটার ডে।"

"স্বাধীনতার মানে জানো?"

"অফকোর্স, স্বাধীনতার মানে ফ্রীডম।"

"কিসের ফ্রীডম?"

"কেন, শাসনের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, কাজ করার স্বাধীনতা।"

"অকাজ করার স্বাধীনতার কথা, শুনেছ?"

"না।"

"দুষ্কর্ম করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ?"

"সে আবার কী"

"ওই তো মানুচন্দ্র, আকাশ থেকে পড়লে মানিক! এ-দেশে যে-কেউ যা-খুশি করতে পারে! চারটে লোক চেপে ধরে তোমার মাথাটা কামিয়ে দিয়ে যেতে পারে!"

"যাঃ, তা কখনও হয়?"

"হয় মানিক। ইট মেরে তোমার জানলার সব কাচ ভেঙে দিয়ে যেতে পারে। তোমার বাগানের সব গাছ উপড়ে নিয়ে যেতে পারে।"

"রাইফেল চালাব, ডালকুত্তা লেলিয়ে দোব।"

"খুনেরদায়ে পড়বে। শেষ জীবনটা জেলে কাটবে। তোমার বাগানে বাস্তু-ঘুঘু চরবে।"

"সে কী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকাল পালটে গেছে ভাই। সেই শান্তশিষ্ট বাঙালির যুগ আর নেই। সব সময় কাড়ানাকাড়া, আর দামামা বাজছে মানুষের রক্তে। সাধে ভদ্রলোক বাড়ি আর বাগান বেচতে চাইছেন?"

"তুমি যখন জানোই, তখন আমাকে শুধু-শুধু নাচিয়ে দিলে কেন? আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।"

"হতাশ হয়ো না। আমাকে একটু তলিয়ে দেখতে দাও। ধ্যানে সব ধরা পড়বে।"

"সে আবার কী?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

"তার মানে তুমি ভূত নামাবে?"

"ভূত ছাড়তেও পারি।"

"তার মানে, তোমার কিছু পোষা ভূত আছে?"

"ধরো, সেই রকমই।"

"তার মানে, তুমি মহাদেব?"

"পাঁচজনে তো সেই রকমই বলে?" বড়দাদু বললেন, "ভূতো, টেলিফোন ডাইরেকটারিটা নিয়ে আয়।"

আমার এক একদিন এক এক নাম। কাল ছিল গজা, আজ হয়েছে ভূতো। কৃষ্ণের শতনামের মতো, আমার সহস্র নাম।

দাদু বললেন, "তুমি আমার নামাবলী। মাঝে মাঝে আসল নামটাই ভুল হয়ে যায়।" দাদু জিজ্ঞেস করেন, "তোর আসল নামটা কী ছিল রে গবা?" আমাকে তখন মায়ের কাছে ছুটতে হয়। স্কুলে মাঝে-মধ্যেই এই নাম ভুলে যাবার জন্যে পিটুনি খেতে হয়। সকাল থেকে যার নাম চলেছে অ্যাটলাস কি হটেনটিট, সে বারোটার সময় অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের পিণ্টু ডাকে সাড়া দিতে দু'চার মিনিট দেরি করলে কিছু বলার আছে? হয়তো আছে, তা না হলে ডাস্টার-পেটা খেতে হবে কেন?

দাদু ফোনে অবনীকে ডাকলেন। "শোনো হে অবনী।"

অবনীর ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপল। গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। যেমন, জায়গাটা কোন্ দলের এলাকা? আশেপাশে কী আছে? কলকারখানা আছে? বস্তি আছে? চায়ের দোকান আছে? ক্লাব আছে? নর্দমা কত দূর দিয়ে গেছে? পাকা, না কাঁচা? বড় রাস্তা

কতদূরে। এলাকায় ছোট ছেলের সংখ্যা বেশি, না যুবকের সংখ্যা, না বৃদ্ধ? স্কুল কত দূরে!

দাদু এক-একটা ফিরিস্তি বের করছেন, আর মেজদাদু তারিফ করে উঠছেন, "বাহবা, বাহবা!"

পাক্কা আধঘণ্টা লাগল টেলিফোন শেষ করতে।

মেজদাদু বললেন, "কবে নাগাদ তোমার খবর আসবে?"

"কালই এসে যাবে। অবনী কাজ ফেলে রাখার ছেলে নয়। তার নীতি হল, কাজ সেরে বসি, শত্তুর মেরে হাসি।"

দাদু বললেন, "যাও টমেটম, ডাইরেক্টারিটা যথাস্থানে রেখে এসো, তোমার ফাদার আবার এখুনি চেঁচাতে শুরু করবে। বড় মেথডিক্যাল মানুষ। আর হবে না কেন? মেথডিক্যাল না হলে জীবনে অত উন্নতি হয়। এই যেমন আমার কাজের ধারা দ্যাখো। সব আটঘাট বেঁধে ধীরে-ধীরে এগোই। তোর মতো অমন হালুম করে লাফিয়ে পড়ি না। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা বাঘ নই, মানুষ।"

"তোমার কি মনে হয়, হালুম করে লাফিয়ে পড়ে বলে বাঘের কোনও ক্ষতি হয়? বাঘ কত বড় প্রাণী জানো? তুমি সামনাসামনি বাঘ দেখেছ?"

"বাঘ দেখিনি? কী বলিস রে? ওই ব্যাটাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর শীতকালে আমরা চিড়িয়াখানায় যাই।"

"হ্যাঃ, চিড়িয়াখানার বাঘ আবার বাঘ! ও তো এক একটা শেয়াল। বাঘ দেখেছি আমি। কুমায়ুনের মানুষখেকো। যেমন তার রঙ, তেমনি তার ব্যবহার। আহা!"

"খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার?"

"আরে না না, ভদ্র-অভদ্রের কথা আসছে কী করে? বাঘ কি ভদ্রলোক? বাঘের ব্যবহার বাঘের মতো। এক একটা লাফ কী! এই এ পাড়া থেকে ও পাড়া। হালুম করে মারলে লাফ, মাথার ওপর দিয়ে কোথায় যে চলে গেল!"

"মানে ওভারবাউণ্ডারি! ফীল্ডিং ভাল না হলে, সব বলই

ওভারবাউণ্ডারি হবে। ক্যাচ মিস করা আমাদের ইণ্ডিয়ান টীমের একটা রোগ। এ সব প্লেয়ারদের দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত।"

"নাঃ দাদা, সত্যি তোমার বয়েস হয়েছে। হচ্ছে বাঘের কথা, টেনে আনলে ক্রিকেট। বাঘ কি ক্রিকেট-বল যে লাফিয়ে উঠে ক্যাচ ধরব, আর আম্পায়ার আঙুল তুলে বলবেন, হাউজ দ্যাট? তুমি রোজ একটা করে ভিটামিন খাও।"

"ভিটামিন তুই খা। আমি রোজ পুঁইশাক খাই। শিকারির হাতে রাইফেলটা কী জন্যে থাকে। সেইটা দিয়ে দুম করে মারা যায় না?"

"আজ্ঞে না, যায় না। তুমি শিকারের কিছুই বোঝো না।"

"একটা রাইফেল দে না, দেখিয়ে দিচ্ছি, শিকারে কী বুঝি আর না বুঝি।"

"এখন আর তেমন বাঘ নেই, থাকলেও মারা যাবে না।"

"কেন নেই।"

"নেই তাই নেই।"

"তোমার মাথা। ওই গর্দভের মতো হালুম-লাফ মেরে-মেরেই জাতটা শেষ হয়ে গেল। বাঘের যদি আটঘাট বেঁধে কাজে নামার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমাকে আর এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়তে হত না, বাঘের পেটে স্বর্গে যেতে।"

"তুমি যাই বলো, বাঘ মানুষের চেয়ে ঢের বড়।"

"বড় হলেই মানুষ হয় না। মানুষ বাঘের চেয়ে ঢের ঢের ঢের বড়। তিন ঢেড় বড়।"

"বাঘ তা হলে ছ ঢের বড়।"

"মানুষ তা হলে বারো ঢের।"

"বাঘ তা হলে চব্বিশ।"

"মানুষ তা হলে আটচল্লিশ।"

"বাঘ ছিয়ানব্বই।"

"মানুষ তাহলে একশো বিরানব্বই।"

বাঃ এ যেন নিলাম হচ্ছে! কার দর কোথায় ওঠে! নাঃ ব্যাপারটা ফয়সলা হল না। মা এসে পড়ল। মা এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনও গোলমাল দেখলেই মা ছুটে আসবে। সেই বলে না, শান্তির শ্বেত পারাবত, দু' দেশের নেতা এক জায়গায় হলেই যা দু'হাতে আকাশে ওড়ান আর বলতে থাকেন, ভাই, ভাই। মাকে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত!

মা ঘরে ঢুকেই 'বললে, "তোমাদের কোনও কাজ নেই?"

দু' দাদু এক সঙ্গে বললেন, "না আমাদের আবার কাজ কী! সংসারের সব কাজ আমরা শেষ করে বসে আছি! আমরা এখন রিটায়ার্ড।"

মা মেজদাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমার দাঁত মাজা হয়েছে?"

মেজদাদু হেহে করে হেসে বললেন, "দাঁত, আমার দাঁত নিজেই নিজেকে মাজছে। সে হল স্বাধীন, আমার তোয়াক্কাই করে না।"

মা বড়দাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, "বাবা, তোমার বেড়ানো হয়ে গেছে?"

"আজ আবার বেড়ানো কিসের? আজ তো রবিবার। আমরা এখন বাঘ মারব।"

"দাঁড়াও, তোমাদের বাঘ মারা আমি বার করছি।" মা গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন, "পুষ্প, পুষ্প, এই ঘরটা আগে ঝাঁট দিয়ে মুছে নে।"

দাদু বললেন, "উঠে পড়ো ভায়া, ঝেঁটিয়ে বিদায় করারপ্ল্যান। ঝগড়া না করে তুই যে এক ঝায়গায় চুপ করে বসতে পারিস না! বয়েস হচ্ছে, স্বভাবটা পাল্টা না!"

"বাঘের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। বাঘ ইজ এ বাঘ ইজ এ বাঘ।"

পুষ্পদি ফুলঝাড়ু, বালতি আর ন্যাতা নিয়ে নেতার মতো ঘরে ঢুকল।

সন্ধের দিকেই অবনীবাবু এসে গেলেন। ন্যাড়া মাথায় ক্রিকেট টুপি। টাইট প্যান্ট, জামা ভেতরে গোঁজা। স্বাস্থ্য বেশ ভালই।

দরজার সামনে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে খোকা, ইহা কি গঙ্গাধরবাবুর বাড়ি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গেটের বাইরেই তো নাম লেখা আছে।"

"ছোটখাটো জিনিস আমার চোখে পড়ে না।"

"আমার দাদু ছোটখাটো মানুষ ?"

"আচ্ছা আড়বোঝা ছেলে তো! দাদু বাড়ি আছেন ?"

"হ্যাঁ আছেন।"

"গিয়ে বলো অবনী এসেছে।"

"এসেছে নয়, এসেছেন।"

"সে তো তুমি বলবে, আমি বলব কেন ? কুকুর আছে ?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তিনি কোথায় ?"

"তিনি নয়, সে।"

"ওই হল রে, বাবা। সব কথায় অত ভুল ধরো কেন ? সেই কুত্তাটা এখন কোথায় ?"

"কুত্তা নয়, কুকুর।"

"খাতির করলেও ভুল ধরবে, খাতির না-করলেও ভুল ধরবে। এ ছেলে বড় হলে দেখছি নির্ঘাত স্কুলমাস্টার হবে।"

"কুকুর এখন ছাতে দাদুর সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছে আর গান গাইছে।"

"গান গাইছে নয়, ন্যাজ নাড়ছে। এইবার তোমার ভুল ধরেছি।"

"আমাদের কুকুর গানও গায়।"

"আমাকে আর যেতে হল না, দাদুই এসে গেলেন। "কার সঙ্গে বক বক করছিস রে হুলো ? ও, অবনী এসে গেছ! এসো এসো, ভেতরে এসো।"

সেই অদ্ভুত অবনীবাবু হাতজোড় করে দাদুর পেছন-পেছন বসার ঘরে ঢুকে গেলেন। ভাল সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। দাদু বললেন, "ওখানে বসলে কেন ?"

"আজ্ঞে, যার যেমন জায়গা। ও সব বড় মানুষেরী জন্যে। আমাদের জন্যে এই ভাল।"

"তুমি কি ছোট মানুষ?"

"আরেব্বাপ, কী বলছেন আপনি? আমার কোনও এডুকেশন নেই। আপনি বাঁচিয়েছিলেন বলে জেলের বাইরে আছি, করে খাচ্ছি।"

"তুমি আমাকে ভালবাসো?"

"আরেব্বাপ, জিন্দেগিতে আমি একজনকেই ভালবাসি, সে হল আপনি।"

ভদ্রলোক কী ভাবে কথা বলছেন! কী রকম ভয়ে-ভয়ে বসে আছেন জড়সড় হয়ে!

মেজদাদুর শুকনো কাসি হয়েছে। খক্ খক্ করতে-করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। বড়দাদু প্রশ্ন করার আগে মেজদাদুই শুরু করলেন, হ্যাঁ, তা হলে কী বুঝলেন?"

বড়দাদু বললেন, "তুমি একদম নাক গলাবে না। চুপ করে বোসো। খক্ খক্ করে কাসাও চলবে না।"

"যদি কাসি পায়?"

"বাইরের বাগানে চলে যাবে। ঝাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেসে আসবে।"

অবনীবাবু বললেন, "তা হলে আমি স্টার্ট করি।"

"না, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমার কি কেউ মারা গেছেন?"

"কই, না তো!"

"তা হলে মাথা মুড়িয়েছ কেন?"

"আজ্ঞে, চুলের চিকিৎসা চলেছে। ভুশভুশ করে সব চুল উঠে যাচ্ছে। দু'বার ন্যাড়া হয়েছি, আরও দু'বার ন্যাড়া হব।"

"এবার তা হলে একটা টিকিও রাখ। ইলেকট্রিসিটি খেলবে, খাড়া-খাড়া চুল বেরোবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব। তা হলে বলি।"

মেজদাদু বাধা দিলেন। "চুলের বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।

মাথা যখন মুড়িয়েছেন, তখন আর-একটা কাজ করুন, রোজ সকালে মাথার গরম গোবর লেপে দিন। পনেরো দিনের মধ্যে কচি-কচি চুল বেরিয়ে যাবে।"

"গরম গোবর আমি পাব কোথায়?"

"একটা গোরু কিনে ফেলুন। পেটে দুধ, মাথায় গোবর।"

"অবনী।" বড়দাদু কড়া গলায় ডাকলেন, "বড় বাজে বকছ হে নাও শুরু করো। জানো আমার সময়ের দাম আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চারপাশ, ফাঁকা।"

"কোথায় ফাঁকা?"

"ওই যে, বাগানবাড়িটা যেখানে। চারপাশে ধূধূ মাঠ, অচেনা পথঘাট। কাছাকাছি একটা নদী আছে। নাম, ইছামতী।"

মেজদাদু বললেন, "ব্যাস, ব্যাস, আর আমার কিছু চাই না। নদী, বাগানবাড়ি। বহুদিনের ইচ্ছে, শেষ জীবনটা লিখে কাটাব। জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম বইটার নাম হবে 'ভদ্রলোক বাঘ, অভদ্র মানুষ'। দ্বিতীয় বইটার নাম, 'সাহসী চিতা।"

বড়দাদু বললেন, "আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার ওই সব রাবিশ আমি পড়তেও পারব না, ভূমিকাও লিখতে পারব না।"

"কে বলছে তোমাকে ভূমিকা লিখতে? আমি বিলেত থেকে জেরালড ডারেলকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে আনব।"

"তাই এনো? অবনী, তুমি বলে যাও।"

"আজ্ঞে, আশেপাশে যখন মানুষই নেই, তখন ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতীর প্রশ্নই আসে না আসে কি?"

"না, আসে না। রাস্তাঘাট?"

"পিচের রাস্তা থেকে আর-একটা পিচের রাস্তা নেমেছে। সেই রাস্তা থেকে আর-একটা সরু রাস্তা, সেটা থেকে আর একটা। ঘুরপাক খেতে-খেতে সেই বাড়ি।"

"কতটা হাঁটতে হবে?"

"মাইল দুয়েক।"

"চলবে না। ক্যানসেল।

"মেজদাদু বললেন, "ক্যানসেল কেন?"

"অতটা কে হাঁটবে?"

"সাইকেল কিনব।"

অবনীবাবু বললেন, "আপনারা অন্তত একবার দেখে আসবেন চলুন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বাগানে খুব ভাল-ভাল গাছ আছে। পাখির ডাক কী, কাছে যেন সারেঙ্গি বাজছে সারাদিন।"

"বেশ, তাই হোক। চলো, কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ি।"

মেজদাদু বললেন, "খুউব ভাল কথা।"

বড়দাদু বললেন, "তুমি চুপ করো। ভাল কথা কি খারাপ কথা সে আমি বুঝব। অবনী, তুমি আজ রাত্রে এখানেই থাকবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ছাতে শোব।"

"তাই শুয়ো।"

"মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।"

"কেন, মাংস কেন?"

"বড় লোভ হয়েছে।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

"একটু চাটনি।"

"তাও হবে।"

"শেষ পাতে একটু দই।"

"ব্যাস, ওইতেই শেষ"।

"হ্যাঁ, আর না, শুধু এক খিলি পান।"

"এক খিলিতে তোমার হবে না বাপু, দুখিলি পাবে।"

মেজদাদু বললেন, "জর্দা চলে নাকি?"

"আজ্ঞে, সে ব্যবস্থা আমার পকেটে আছে।"

"আমার স্ত্রীর কাছে লাখনোর এক নম্বর জিনিস আছে। তোমাকে দেব।"

"আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসি।"

"হ্যাঁ এসো, বুঝতেই পেরেছি, অনেকক্ষণ ধূমপান হয়নি।"

"আজ্ঞে, ধরেছেন ঠিক।"

সকাল না হতেই বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাথরুম থেকে বড়দাদু বেরোন তো মেজদাদু ঢোকেন। মেজদাদু বেরোন তো বড়দাদু ঢোকেন। ওঁদের এই ঘনঘন আনাগোনা দেখে মা রেগে-রেগে উঠছে। বাবা বললেন, 'তুমি আর আগুনে কাঠ গুজো না। দু'জনেই নার্ভাস ডায়েরিয়ায় ভুগছেন, পারো তো ঘুমের ওষুধ খাওয়াও।"

"যাবেন বাগানবাড়ি দেখতে, অত ভয়ের কী আছে বাপু? সঙ্গে অমন ছেলে যাচ্ছে!"

অবনীবাবু এক-রাতেই আমার দাদা হয়ে গেছেন। অবনীদা বুকটা একবার ফুলিয়ে নিলেন। বাবা বললেন, "তুই বৃদ্ধকে নিয়ে আজ তোমার বরাতে খুব দুঃখ আছে।"

"আজ্ঞে, দুঃখই তো জীবন।"

"হ্যাঁ, বুঝবে ঠ্যালা। তখন এই কথাটা তোমার মনে থাকলে হয়।"

বড়দাদু বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন, মেজদাদু ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "তোমার কী হল বলো তো দাদা! এতবার যাচ্ছ আর আসছ!"

অবনীদা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আজ আর আপনারা যেতে পারবেন না। আমি বরং কাল সকালে আসি।"

"আরে না না। এটা আমাদের বংশগত রোগ। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে না দিলে, এ চলতেই থাকবে।"

"আজ্ঞে, ধাক্কা দেবার কেউ নেই? এদিকে তো নটা প্রায় বাজল।"

"ধাক্কা কে দেবে বল, আমরা যে বড্ড বড় হয়ে বসে আছি।"

"তা হলে নিজেরাই এবার নিজেদের ধাক্কা দিন।"

"হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আমি মেজকে দোব, মেজ আমাকে দেবে।"

যাক, দশটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। দাদুর ব্যাপারেআমাকে সঙ্গে থাকতেই হবে। মা'ও তাই চায়। বাইরে একা একা বেরোলে দাদু ভীষণ চানাচুর খান। সেবার দুশো গ্রাম চানাচুর খেয়ে ভীষণ কাণ্ড

করেছিলেন। আমরা চলেছি টানা ট্যাকসিতে। মেজদাদুর গা থেকে ভুর ভুর করে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে। অবনীদার মুখ থেকে জর্দার।

'হু-হু করে গাড়ি ছুটিয়ে প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা সেই বাগান-বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। মেজদাদু নেমেই বললেন, "আহা স্বর্গ!"

বড়দাদু ধমক দিলেন, "তুমি একটাও বাজে কথা বলবে না। স্বর্গ কি নরক সে আমরা বুঝব।"

ট্যাক্‌সি-ড্রাইভার বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদু, বেশি লাফালাফি করলে চড়া দাম হাঁকবে।"

বড়দাদু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার ওই দাদু ডাকটা বদলানো যায় না! লেখাপড়া তো করেছ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই, এ-শিক্ষাটা হয়নি?"

"আজ্ঞে, তাহলে কী বলব?"

"কিছুই বলবে না! না বলেও তো বলা যায়।"

মেজদাদু যোগ করলেন, "যেমন না বলা বাণী!"

"আবার বাজে বকছ?"

"যাব্বাবা, একটা কথাও বলা যাবে না?"

"না, যাবে না। কোন্ কথায়, কী কথা বেরিয়ে আসে, কে বলতে পারে!"

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। আমরা আবার ফিরে যাব।

বাগানটা সত্যিই বিশাল! বহু ধরনের গাছ। আমগাছে বোল এসেছে। গন্ধে মাত। মৌমাছি ভ্যান-ভ্যান করছে।

বড়দাদু আপন মনে বললেন, "অ্যাসেট। এমন জিনিস কি কেউ ছাড়বে! কে জানে।"

মেজদাদু বললেন, "এবার কী হল দাদা! তুমি যে প্রশংসা করলে! দাম বেড়ে যাবেনা?"

"তুমি ছাড়া কেউ শুনেছে?"

"আমি যখন স্বর্গ বলেছিলুম, তুমি ছাড়া কেউ শুনেছিল?"

"তুই বড় তর্ক করিস।"

"হ্যাঁ, সত্যি কথা বললেই তর্ক হয়ে যায়।"

"তোর বাড়ি তুইই তাহলে বোঝ, আমি তোর কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। ফিরে চললুম।"

বড়দাদু সত্যি সত্যিই গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। অবনীদা এক হাত ধরেছেন, মেজদাদু আর এক হাত, আমি জাপটে ধরেছি কোমর!

মেজদাদু বলছেন, "তুমি চট করে বড় রেগে যাও।"

অবনীদা বলছেন, "নিজেদের মধ্যে অশান্তি ঠিক নয়।"

গাড়ির চালক বলছেন, "ওই করেই বাঙালি জাতটা শেষ হয়ে গেল।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা বাঙালি নই। দেখবে আমাদের একতা? চল্ মেজ, চল্।"

হাওয়া সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গেল। বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। তুমি আসল খবরটা নাওনি অবনী।"

"কালও তো আমি লোক দেখে গেছি। দাঁড়ান, একবার দেখি!"

অবনীদা গেটের লোহার তালা বাজাতে লাগলেন। কী তার শব্দ!

অনেক দূর থেকে কে একজন হেঁকে বললেন, মেরে তক্তা করে দোব। আবার ফিরে এসেছিস!"

অবনীদা চিৎকার করে বললেন, "আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি স্যার।"

বড়দাদু মৃদু ধমক দিলেন, স্যার বলছ কেন? আমরা কি চাকরি চাইতে এসেছি? আমরা কিনতে এসেছি। সেই ভাবে ডাঁটে কথা বলো অবনী।"

অবনীদা আবার চিৎকার করলেন, "আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি মশাই।"

"মাথা কিনে নিয়েছেন!" উত্তর এল জবরদস্ত।

অবনীদা বড়দাদুর দিকে করুণ মুখে চেয়ে বললেন, "এর উত্তরে কী বলব?"

"কিচ্ছু বলবে না। বড় মাছ তুলতে গেলে একটু খেলাতে হয়। এখন স্রেফ সুতো ছেড়ে যাও।"

ঢলঢলে সাদা প্যান্ট আর হাফ-হাতা জামা পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। সামনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঝুলছে। দেখলেই হাসি পায়। কোথায় কিছু নেই, এতখানি একটা দাড়ি। চোখে মোটা চশমা। গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললেন, "সব কিছুর একটা সভ্যতা আছে।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা তো কোনো অসভ্যতা করিনি।"

"সভ্যতা, অসভ্যতার বোধটাই তো আপনাদের নেই। গেটে তালা বাজাচ্ছিলেন কেন? এটা কি আফ্রিকার বাদ্যযন্ত্র? আপনারা কি কনসার্ট পার্টি?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে?"

"কী ভাবে তাহলে ডাকব? কলিংবেল নেই যে।"

"ডাকবেন না। গেটে তালা মানেই দেখা করার সময় চলে গেছে। সকাল নটা থেকে এগারোটা, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা।"

"কই, কাগজে লেখেননি তো?"

"সব কথা কি লেখা যায়! বিজ্ঞাপনের খরচ জানেন? সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু জিনিস বুঝে নিতে হয়।"

মেজদাদু বললেন, "অলিখিত আইনের মতো!"

"দ্যাটস রাইট।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা তাহলে কী করব এখন? ফিরে যাব?"

"সে আপনাদের ইচ্ছে। ফিরেও যেতে পারেন, আশেপাশে ঘোরা-ঘুরিও করতে পারেন, তিনটে বাজলে আসবেন। হ্যাঁ, যাবার আগে একটিন রঙের দাম দিয়ে যেতে হবে।"

"সে আবার কী।"

"এই যে তালা ঠুকে এই জায়গার রঙ চটিয়েছেন।"

বড়দাদু বললেন, "প্রমাণ আছে?"

"তার মানে ?"

"ওটা যে চটেই ছিল না তার কোন প্রমাণ আছে ?"

"আমি বলছি, এই তো যথেষ্ট প্রমাণ।"

"তা হলে আদালতেই ফয়সালা হবে। এই নিন আমার কার্ড।"

বড়দাদু গেটের এপাশ থেকে ওপাশে ভদ্রলোককে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি জানি কী লেখা আছে, দাদুর নাম এম এ, এল এল বি, অ্যাডভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট। নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। আমার দাদুকে না চিনেই বড় বড় কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আইন ব্যবসায়ী ?"

"কী মনে হচ্ছে ? একটা মানহানির মামলা তা হলে ঠুকে দি ?"

মেজদাদু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠুকে দাও দাদা। মেরে তক্তা করে দোব বলেছেন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কে ? অ্যাডিং ফিউয়েল টু দি ফায়ার ?"

"আজ্ঞে, আগুনটা জ্বেলেছে কে ? এইবার বুঝুন ঠ্যালা। আমি উত্তরপ্রদেশের কনজারভেটার অব ফরেস্ট, বহু বাঘ মেরেছি জীবনে, বড় বড় বাঘ, বড় বড় বাঘ।"

"আমি কে জানেন ?"

"আপনি ? আপনি একজন অভদ্রলোক।"

"তা হলে এই নিন আমার কার্ড।"

উঃ, দারুণ জমেছে ! কার্ডের খেলা চলেছে। তাস খেলা ! টেক্কার ওপর টেক্কা পড়ছে।

বড়দাদু কার্ডটা উলটে-পালটে দেখলেন। মেজদাদু পাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছেন। আমি আর অবনীদা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

বড়দাদু বললেন, "আপনি ডক্টর ভবেশ মহাপাত্র ? আমার বিশ্বাস হয় না।"

মেজদাদু বললেন, স্পেস সাইনটিস্ট ভবেশ মহাপাত্র, যিনি মহাশূন্যে রকেট ওড়ান ? তাঁর তো এখন ফ্লোরিডায় থাকার কথা।"

"আঃ, তুমি চুপ করো। সব কথায় কথা বলো কেন ? ফ্লোরিডা কি না জানি না, তবে ভারতে থাকার কথা নয়। বড় বড় লোকেরা সব ভারতের বাইরে থাকেন।"

ভবেশবাবু বললেন, "আমি ফিরে এসেছি। আমি ফিরে এসেছি। সবাই বলছে, আমার মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে।"

"প্রমাণ আছে ?"

"পাগলের প্রমাণ পাগলামি !"

"যেমন ?"

"আমার বিশ্বাস ঢেঁকি স্বর্গে যেতে পারে। আমি সেই ঢেঁকির খোঁজে ভারতে এসেছি।"

"আমিও বিশ্বাস করি। নারদ যে ঢেঁকি চড়ে আসা-যাওয়া করতেন, সেই বিশেষ ধরনের ঢেঁকিটি খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও অবহেলায় পড়ে আছে।"

"আফগানিস্থানেও থাকতে পারে।"

"এ আপনি কী বলছেন, ঢেঁকি হল ভারতবর্ষের জিনিস, বিশেষত বাংলার।'

"আরে মশাই, ঢেঁকি যে সময় বাহন ছিল, সেই সময় বিশাল আর-একটা মহাদেশ ছিল, ভারত, আফ্রিকা-টাফ্রিকা নিয়ে।'

"আপনি কিস্যু জানেন না।"

"আপনি কিস্যু জানেন না, এ আপনার হাইকোর্ট নয়।"

"আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন "

"ঘোড়ারও যে ডিম হয়, তাই তো আপনি জানেন না।

"তাই নাকি ? কোন ঘোড়ার, আপনার ঘোড়ার ?"

"আজ্ঞে না, পক্ষীরাজের। আমার কাছে আছে, দেখতে চান ?"

"বাড়িতে ঢুকতেই দিচ্ছেন না তো ডিম দেখা !"

"এইবার দোব, আপনি আমার মনের মানুষ, তবে একটা শর্ত।

ঢেঁকি শুধু বাংলা দেশেই খুঁজলে হবে না, এলাকা বাড়াতে হবে। ওদিকে এশিয়া মাইনর, এদিকে আফ্রিকা।"

"বেশ, তাই হবে।"

ঢলঢলে জামার পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে তিনি তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। একবার এ চাবি ঢোকান, একবার ও চাবি ঢোকান। তালা কিন্তু খোলে না। কী করে খুলবে! তালা একটা চাবি, পঞ্চাশটা। আমার দাদুর দেরাজ খোলার অবস্থা। ভুল চাবিটাই বারে-বারে ঘুরে ঘুরে আসে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তিনি করুণ মুখে বললেন, "কী হবে, চাবি যে মিলছে না! আপনারা গেট টপকে ঢুকতে পারেন না? আমার ছেলে ঢোকে।"

"আজ্ঞে না, সে-বয়েস আর নেই। ছেলেবেলায় টিফিন আওয়ারের পর স্কুলে ঢুকেছি গেট টপকে, যৌবনে যাত্রা দেখে বাড়ি ঢুকেছি পাঁচিল টপকে।"

"আমার এই তালাটা মাঝে মাঝে বড় ভোগায়। একটা কাজ করলে হয় যখন খুলবে তখন যদি ঢোকেন।"

"তার মানে?"

"মানে খুব সহজ, বাইচান্স, এক সময় চাবি লাগবেই, তালা খুলবেই, সে ধরুন আজও হতে পারে, কালও হতে পারে, তখন টুক করে ঢুকে পড়বেন।"

"তার মানে, সেই দুর্গ অবরোধের মতো সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমরা বাইরে বসে থাকব দিনের পর দিন, বছরের পর বছর! মামার বাড়ি আর কী?"

"তা হলে আপনারা চেষ্টা করুন।

রাগ করে ভদ্রলোক চাবির থোলেটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

দাদু বললেন, "অবনী 'চেষ্টা করো।"

অবনীদা একের পর এক চাবি লাগাচ্ছেন আর খুলছেন। বিশাল দু' মানুষ উঁচু গেট। সহজে টপকানো যাবে না। মাথার দিকে খোঁচা-

খোঁচা বর্শার ফলা। বেশ জম্পেশ গেট। অবনীদা ঘেমে উঠেছেন। এতক্ষণ আমরা লক্ষ করিনি, পেছনে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, "ব্যর্থ চেষ্টা, ওই চাবির মধ্যে তালার চাবি নেই। চাবি আমার কাছে। এই দেখুন।"

সুন্দর চেহারার যুবক। এক মাথা এলোমেলো চুল। চোখে রঙিন চশমা। দু' আঙ্গুলে চাবিটি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, "ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, ও হল বিদেশী এজেন্ট, আমার গবেষণার শত্রু, তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব। তোমাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়েছি, আবার এসেছ, আবার এসেছ!"

ভদ্রলোক করুণ মুখে বললেন, "আপনারা, আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। সম্প্রতি ওঁর মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে। দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের বাড়ির ভেতরে সাদরে নিয়ে যেতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন।"

ভবেশবাবুর পেছনে এক বিদেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোক বললেন, "আমার স্ত্রী লরা। লরা, তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

সেই বিদেশী মহিলা, অসীম স্নেহে দেশী বিজ্ঞানীকে মেয়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলেকে যে ভাবে ভোলাতে থাকে, সেই ভাবে ভোলাতে লাগলেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, "উড়ন্ত ঢেঁকি ছিল, এখনও আছে, এ-কথা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না!"

দাদু বললেন, "না, করি না, ও হল গল্প-কথা, রূপক। আসলে ঢেঁকি হল রকেট।"

"ইউ আর অল লায়ারস, ফরেন এজেন্টস।"

ভদ্রমহিলা ভবেশবাবুকে ভেতরে নিয়ে চলেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বলছেন, 'তোমরা দেশের শত্রু।

বড়দাদু বললেন, "ভেরি স্যাড, খুবই দুঃখের।"

ভবেশবাবুর ছেলে বললেন, "ভেরি স্যাড।"

দাদু বললেন, "উড়ন্ত ঢেঁকি কিন্তু থাকতে পারে। একবার খোঁজ-পাত করে দেখলে হয় না?"

"মরেছে, পাগলামি দেখছি ছোঁয়াচে। আপনারা এখুনি একে নিয়ে চলে যান। তা না হলে আমার বাবার মতো অবস্থা হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঢেঁকি কিনে ফেলেছেন। এই বাগানবাড়ি বেচে সারা পৃথিবীর ঢেঁকি কিনতে চান।"

দাদু বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারকই প্রথম দিকে পাগল বলে পরিচিত হতেন। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে, তোমরাই তখন একে মাথায় তুলে নাচবে। পরশপাথর কি সত্যিই ছিল না। পক্ষীরাজ কি নিছক কল্পনা? নাগপাশ কি গাঁজাখুরি? পুষ্পক রথ কি গল্পকথা?"

অবনীদা ফিসফিস করে বললেন, "যাঃ, হয়ে গেল! আর একটা উইকেট পড়ে গেল!"

আমি বললুম, "পরশপাথর কিন্তু সত্যিই আছে।"

অবনীদা বললেন, "যাঃ, আরো একটা উইকেট পড়ে গেল!"

মেজদাদু বললেন, "আমার কেমন মনে হয়, কামধেনু এখনও হয়তো আছে। কল্পতরুও থাকতে পারে।"

অবনীদা বললেন, "যাঃ হোল ফ্যামিলি আউট!"

দাদুর বাঁধানো দাঁত

দাদু যখন সকালে বেড়াতে বেরোবেন তখন হাতে থাকবে পাকানোপাকানো বেতের লাঠি। সে লাঠির কী বাহার। বাবা এনে দিয়েছিলেন মুসৌরি থেকে। আর যখন কোনো কাজে বেরোবেন তখন আর লাঠি নয়, তখন আমি তাঁর পাশে এক চলন্ত লাঠি। দাদুর ভারী ডানহাত আমার কাঁধে। আমার উচ্চতাও ওই লাঠিটার মতোই। দাদুর হাতে আমার কাঁধটা বেশ ফিট করে যায়। চলন্ত লাঠির গতি যখন বেড়ে যেতে যায় দাদুর হাত তখন কাঁধ খামচে ধরে পাশাপাশি টেনে আনে। আমার চেহারাটাও ঠিক লাঠির মতো। মা বলেন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম। হবে না! অত খেলে কারুর চেহারা ভাল হয়। অষ্টপ্রহর মুখ চলছে। দুঃখ হয় কথা শুনে কিছু বলতে পারি না। দেওকীনন্দন বলেছে, ঘাবড়াও মাত। চানা চালাও, বঠকি লাগাও, পবননন্দন বন যাও। ঘাড় হো যায়গা লোটা কা মাফিক। হাত হো যায়গা ডাম্বেল কা মাফিক। সম্‌ঝা ছোটা বাবু?

এখন আমরা চলেছি দাঁতের ডাক্তারের কাছে। আমাদের শহরে যেখানে বাজার সেখানে একটা জুতোর দোকানের পাশে ছোটমতো ডাক্তারখানা। ভাঁজ করা দরজার একদিকে একটা কাঁচের কেসে দুপাটি দাঁত সব সময় আমার স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো শীত নেই গ্রীষ্ম নেই খিঁচিয়েই আছে। আর একপাশের দরজায় মাফলার জড়ানো গালফুলো এক মুখের ছবি। যন্ত্রণাকাতর। তলায় গোটা গোটা অক্ষরে

লেখা, দন্তশূল, তিন শূলের এক শূল। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলে মরতে হয়। সামনের দিকে গালফুলোদের বসার জন্যে দুপাশে দুটো বেনচ। ভেতর দিকে পর্দার আড়ালে একটা উঁচু চেয়ার। সেইখানেই ঠেসে ধরে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত তোলা হয়। কোণের দিকে জলের কল, বেসিন। আমি দাদুর সঙ্গে চৌষট্টিবার এই দোকানে এসেছি। কোথায় কী আছে সব মুখস্থ।

দাদুর ওপরের পাটিতে ষোলো, নীচের পাটিতে ষোলোটা দাঁত ছিল। সবই এই ডাক্তারবাবু একটা-একটা করে টেনে-টেনে তুলেছেন। বত্রিশ মাস সময় লেগেছে। দাদুর সে কী গর্ব। সকলের নাকি বত্রিশ দাঁত থাকে না। ঠিক ঠিক ওপরে ষোলোটা আর নীচে ষোলোটা, দুই মিলিয়ে ঠিক বত্রিশ দাঁত লম্বা খাড়া টানা-টানা চোখ, মহাপুরুষের লক্ষণ। দাদুর সব-কটা লক্ষণই স্পষ্ট। তবে একটাই যা দুঃখ, দাদুর সব-কটা দাঁতই এই সিধুডাক্তারের সাঁড়াশি শেষ করে দিয়েছে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাদু বোঝেননি। মা আমাকে বকেন। দাদুকে তো বকতে পারেন না। দাদু যে মায়ের বাবা। অত মিষ্টি খেলে কারুর দাঁত ভাল থাকে। দাদু আবার বাবাকে উপদেশ দেন মিষ্টি খেলেই বেশ ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, দেখবে দাঁত ঠিক থাকবে, একেবারে ছবির মতো। আশি বছরেও বসে বসে ছোলাভাজা চিবোচ্ছ। কচি কলাপাতা থেকে চেটে চেটে তেঁতুলের আচার খাচ্ছ টকাস টকাস শব্দ করে। দাদু এই সব বলেন, আমি মনে মনে হাসি। যিনি বলছেন তিনি নিজেই এখন ফোকলা।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সিধুডাক্তার লিকলিকে একটা ধূপ জ্বেলে দেয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ছবির সামনে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল ছুঁয়ে পিনপিন করে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। গুরুদেবকে মোটেই ভাল দেখতে নয়। দাঁতের ডাক্তারের গুরুদেব বলেই বোধ হয় দাঁত দুটো অত বড় বড়। ছবির দিকে তাকালেই আগে চোখ পড়ে যায় দাঁতে, তারপর গলায় রুদ্রাক্ষের মালায়, তারপরই ভুঁড়িতে। কাউকে বলিনি,

ছবিটা দেখলেই আমার মনে হয়, একেই বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক হল হাতির দাঁত, সেইটাই ফোর্সে বেরিয়ে এসেছে সামনে। নিশ্চয়ই দেহ রেখেছেন। মহাপুরুষদের মৃত্যুকে বলে মহাপ্রয়াণ। আহা দাঁত দুটো ডাক্তারবাবু যদি খুলে নিয়ে ওই শো-কেসে রাখতেন, যেখানে দুপাটি দাঁত মুখ ছাড়াই পড়ে পড়ে হি হি করে ভূতের হাসি হাসছে। গুরুদেবের ছবির মাথার ওপর কাঠের ব্রাকেটে একটি মাটির গণেশ। ভারী ভাল মানিয়েছে। না বাবা, এসব ভাবব না। ওরা যেখানেই থাকুন যদি মনের কথা জেনে ফেলেন নির্ঘাত অঙ্কে ফেল করিয়ে দেবেন।

আমি হুড়মুড় করে দোকানে উঠতে যাচ্ছিলাম। দাদু টেনে ধরলেন, "দেখছ না পূজো হচ্ছে। হুড়মুড় করে ঢুকলেই হল। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।"

দাদুর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই সিধুডাক্তার ওই রকম কপালে ধূপ সমেত হাত ঠেকানো অবস্থাতেই আমাদের দিকে ফিরলেন। চোখ আধবোজা। ঠোঁট নড়ছে বিড়-বিড় করে। সেই ঠোঁটে আমাদের দেখে একটু হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পশ্চিম। সূর্য ওই দিকে ডুবে গেছে অনেক আগে। উনি ওই দিকেই নমস্কার জানালেন। ঘুরে গেলেন দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে পূবে। পূবেই সেই দাঁততোলার বিদঘুটে চেয়ার। ওই দিকে একটু বেশিক্ষণ নমস্কার হল। ও দিকে সূর্য ওঠে। তা ছাড়া ওই দিকেই তো দাঁত তোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা, ফাইভ রূপিজ এ টুথ, টেন রূপিজ এ ফলস টুথ। নিজের দাত ফেলতেও টাকা, নকল দাঁত লাগাতেও টাকা। তবে আসলের চেয়ে নকলের দাম পাঁচ টাকা বেশি।

ডাক্তারবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আরে মুখুজ্যে মশাই, আসুন, আসুন।"

আমরা ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বেন্‌চিতে বসলুম। দাদু বললেন, "তোমার পিতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হলুম।"

ঘাড় কাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ্ঞে ওই জোরেই তো করে

খাচ্ছি। ঘুষি মেরেও তো দাঁত ফেলা যায়, কিন্তু এমন খুস করে দাঁত ফেলতে কটা লোক পারে। ওই তো বিলেতফেরত জোয়ারদার। টেন রুপিজ এ টুথ। এমন হ্যাচকা টান মারে চোয়াল উপড়ে চলে আসে। এক দাঁত তুলতে আর-এক দাঁত তুলে ফেলে।"

"সে যদি বলো, আমার বেলাতেও তোমার হাতে একবার সেই কেস হয়েছে।"

"আজ্ঞে না মুকুজ্যেমশাই, ওটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলুম। আমার চয়েস। দুপাটি দাঁতই তো আমার হাতে ছিল। সব-কটাই তোলার কেস, আগে আর পরে।"

"ও যতই বলো তুমি, মানব না, আমি উকিল মানুষ। ও তোমাদের আদত। দাঁত বুঝতে পার না। আমরাও যে কিছু বুঝতে পারব, সে উপায়ও রাখ না। ইনজেকশান দিয়ে অসাড় করে দাও। আর দাঁত তোলার সময় তোমাদের চোখমুখের চেহারাও অসুরের মতো হয়ে যায়।"

"হেঁ হেঁ, কী যে বলেন!"

"হেঁ হেঁ নয়, চিরকাল তাই হয়ে আসছে। চোখেও ওই এক কিত্তি। ডান চোখে ছানি বাঁ চোখ কেটে ব্লাইণ্ড করে দিলে। এরকম কেস আখচার হচ্ছে, যাক ওসব কথা। আমি এসে গেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। আপনার দাঁত রেডি।"

ডাক্তারবাবু ভেতর থেকে নীল ভেলভেটে মোড়া দুপাটি দাঁত নিয়ে এলেন। টেবিল খুলে রাখতেই মনে হল মুখ ছাড়াই দাঁদু হেসে উঠলেন। জিনিসটা দেখতে আসল দাঁতের মতো অমন ধবধবে সাদা নয়, একটু হলদেটে। নকল দাঁতের সঙ্গে নকল মাড়ি লাগানো। ভেলভেট দিয়ে ডাক্তারবাবু দাঁত দুপাটি দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, "ফাসক্লাশ।"

দাদু ফোঁস করে উঠলেন, "তুমি ফাসক্লাশ বললেই তো আর ফাস-ক্লাশ হবে না, আমাকে পরে দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়, আপনি পরে নিন। পরে দেখে নিন।"

দাদু এতবড় হা করে দাঁত দু'পাটি একে একে পরে ফেললেন। খট-খট করে দুবার আওয়াজ হল। থলথলে মাংস ঝোলা ভালমানুষ ভাল-মানুষ মুখটা কেমন যেন একটুখানি কঠোর কঠোর হয়ে উঠল। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কেমন বুঝছ?"

প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সময় দাঁতের বাদ্য হল। দাদুর ভুরু কুঁচকে উঠল। অসুবিধে ধরে ফেলেছেন। আমি বললুম, "বেশ দেখাচ্ছে। তবে মুখটা যেন কী রকম বদলে গেল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ তা দেখাবে না। যৌবন ফিরে এল যে। গালটাল সব ভরাট হয়ে গেল।"

দাদু বললেন, "সে আমি আয়নায় দেখব; কিন্তু কথা বলতে গেলে দুই রকম দন্তবাদ্য হচ্ছে কেন! মনে হচ্ছে শীতকালে বরফজলে চান করে কথা বলছি।"

সত্যিই তাই। কথার পরেও কথা থেকে যাচ্ছে।

"ও মুকুজ্যেমশাই প্রথম প্রথম একটু হবেই। নিজের দাঁত আর পরের দাঁত। তাছাড়া এতদিন মাড়ি খালি পড়ে ছিল সেখানে হঠাৎ দাঁত এসে গেছে। অ্যাডজাস্ট করে নিতে দু-একদিন লাগবে।"

"আরে, কালই যে আমার বড় আদালতে কেস আছে! ফ্রীডাম অফ স্পীচ না থাকলে বিপক্ষের উকিল তো আমাকে পথে বসিয়ে দেবে।

"তা হলে কাল না-হয় দাঁত খুলেই সওয়াল করবেন।"

"তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ফোকলা মুখে আইনের ভাষা ফসকে যায় যেমন ধরো জুরিসপ্রুডেন্স, ম্যালাফাইড, লিটিগেশান, সাবজুডিস, অ্যাবরিভিয়েশান, অ্যাডজোর্নমেণ্ট, অ্যালিমনি, সবই তো দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। দাঁত ছাড়া সওয়ালে কামড় কমে যায়। আদালত তো কামড়াকামড়ির জায়গা। পাকা নয়, ডাঁসা পেয়ারার কামড়। কাল আবার সেশান কোর্টে লড়াই।"

'তা হলে আজ বরং বাড়ি গিয়ে আপনি ঘণ্টা তিনেক অনর্গল কথা বলে যান, যত সব শক্ত শক্ত ল্যাটিন, ফরাসী, গ্রীক আর ইংরেজী শব্দ

বেছে বেছে। তারপর কাপের জলে দাঁত দু'পাটি ভিজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।"

'তা পড়ব তবে কিছু একটু চিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। নতুন দাঁতের স্ট্রেংথ একটু টেস্ট করে দেখব না। যেমন ধরো চাল-ভাজা, ছোলাভাজা।'

'একেবারে অতটা শক্ত জিনিস দিয়ে বউনি করবেন? সেটা ঠিক হবে না। সবই পারবেন, তবে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। আজ আপনি ভাত বা রুটি খান চিবিয়ে চিবিয়ে, সজনেডাঁটা খান। তারপর ধরুন লেড়ো বিস্কুটে উঠলেন। প্রথম-প্রথম কামড়াবার জন্যে দাঁত একেবারে নিশপিশ করবে। মাড়ি সুড়সুড় করবে। যতই হোক নতুন দাঁত তো। শিশুদেরও নতুন দাঁত ওঠার সময় ওই রকমই হয়। জ্বর হয়, ঘ্যানঘ্যান করে, পেট খারাপ হয়, শক্ত বিস্কুট পেলে কড়মড় করে চিবোয়, আঙুল কামড়ে দেয়।'

'আমারও জ্বর, পেটখারাপ হবে নাকি ডাক্তারবাবু?'

'জ্বর হবে না, তবে পেটটা একটু সামলে। আর একটা সাবধান করে দি, দাঁত দিয়ে কোন কিছু কামড়ে ছিড়ে আনার চেষ্টা করবেন না।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন শাঁকালুর খোলা, কিংবা হাড় থেকে মাংস, আখ। ওই কুকুরে যেমন ছেড়াছিড়ি করে না, ওই জিনিসটি চলবে না, পাটি থেকে দাঁত খুলে যাবে।'

'তা হলে আর কী দাঁত বাঁধালে তুমি?'

'আজ্ঞে এ আপনি কী বলছেন। বাঁধানো দাত আর নিজস্ব দাঁতে একটু তফাত তো হবেই। নিজস্ব দাঁত এক-একটা মাড়িতে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি শিকড় চালিয়ে বসে আছে।'

'আচ্ছা ডাক্তার, নিমদাঁতন করা যাবে?'

'সে কী। দাঁতন কেন করতে যাবেন শুধু শুধু।'

'শুধু শুধু? নিমদাঁতন শুধু শুধু? তুমি কী বলছ ডাক্তার? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নিম।' দাদু ভীষণ চটে উঠলেন। সিধুডাক্তার

মিউমিউ করে বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি সেভাবে বলিনি, তবে এ দাতের তো মাজন আলাদা, তাই আর কি।'

নিম কি শুধু মাজন, নিম হল অ্যানটিসেপটিক, নিম ইজ এ মেডিসিন, পঞ্চবটের এক বট। আমি এই দাঁতেই নিমদাঁতন করব, আই মাস্ট, নিম ইজ মাই হেলথ, ওয়েলথ এণ্ড ফ্রেণ্ড।'

কড়কড়ে তিনশো টাকা গুনে গুনে ডাক্তারের হাতে গুজে দিয়ে দাদু আমার হাত ধরে উঠে পড়লেন। টেন রূপিজ এ টুথ হলে তিনশো কুড়ি হবে। কি জানি, পাইকারী দাম বোধ হয় তিনশো।

বাড়ি ফিরে দাঁত পরে দাদু চেয়ারে বসলেন। মা তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন। প্রথমে মুড়ি চিবিয়ে দাঁত পরীক্ষা হবে। দেওকী-নন্দন নারকেল ভাঙছে। দু-এক কুচি নারকেলও পরীক্ষা করবেন। বাবা এর আগে মুখ ভাল করে দেখে রায় দিয়ে গেছেন, ন্যাচারাল টিথে আপনার ফেসকাটিং যেমন ছিল, ফলস টিথে একটু বদলে গেছে। ঠিক সে-রকমটি হল না। সামনের ঠোঁট উঁচু হয়ে আছে। সেই শার্পনেসটা নষ্ট হয়ে গেল।

ওপরের ঠোঁটে হাতের চাপ দিতে দিতে দাদু থেকে থেকেই বলতে লাগলেন, 'ও একটু উঁচু আছে তো কী হয়েছে, হাতের চাপে চাপেই ঠিক করে দেব। ওটার জন্যে ভাবি না। ভাবছি খুলে না পড়ে যায়।'

মা মুড়ি দিতে দিতে বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে। একবার হাসুন তো।'

দাদু লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। মা বললেন, "বাঃ কী সুন্দর হাসি। মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের সারি। আমাদের সকলের যদি এমন হত।'

"আমি খুব তাড়াতাড়ি অমন করে ফেলব মা। সামনের দুটো দাঁতে পোকা ধরিয়ে ফেলেছি।'

"বেশ করেছ। মাথা কিনে নিয়েছ।' মা হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙচালেন। দাদুকে বলে গেলেন, "বাবা, কাল থেকে নিমদাঁতন।'

দাদু বসে বসে নতুন দাতে মুড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন, সঙ্গে

আবার নারকেলকুচি। মনেমনে ভাবলুম, হয়ে গেল, নতুন দাঁতের আজই বারোটা। পরে জানতে পারব, এখন পড়তে বসি।

পরদিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। ফর্সা রঙে কালো চকচকে কোট কেমন মানিয়েছে। বড় আদালতে কেমন লড়ে এলেন কে জানে! দাদুর পাশে থেকে থেকে আইনের ভাষা আমিও কিছু শিখে ফেলেছি। আজ বোধহয় সেই কেসটা ছিল, ফেলারাম ভার্সাস নগেন দাস। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুই মক্কেলে দশ বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে। দাদুর মুখ গম্ভীর। বেতের মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছেন নিচু হয়ে। মা সামনে দাড়িয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, "কী হল বাবা? এত গম্ভীর?"

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী হল? এই দ্যাখো! কোটের পকেট থেকে দুপাটি দাঁত বেরোল। এ কী, দাঁত মুখ থেকে পকেটে! দুটো গোল গোল চাকতি বেরোল। "দূর করে ফেলে দিয়ে আয় আঁস্তাকুড়ে।"

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী?"

দাদু ফেটে পড়লেন, "এই দাঁতের জন্যে আজ কনটেমপট অফ কোর্ট হয়ে জেলে যেতে হচ্ছিল। নগেন দাসের উকিলকে আমি একেবারে ঠেসে ধরেছি নারকেলগাছ ফেলারামের দিকে প্রায় এনে ফেলেছি। জজসাহেবকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছি। মুখ দিয়ে ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। হঠাৎ ওপর পাটির দাঁত ঠকাস করে খুলে পড়ে গেল টেবিলের ওপর, আর এই চাকতির একটা সুদর্শনচক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা জজসাহেবের কপালে লেগে তাঁর টেবিলের ওপর। হোয়াট ইজ দিস? আমি উত্তর দেবার আগেই উকিল বলে উঠলেন, দ্যাট ইজ ওয়াশার স্যার। জজসাহেব ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলেন কোত্থেকে এল, কে ছুঁড়েছে। তিনি বললেন, ইট কেম, ফ্রম হিজমাউথ। আপনার মুখ এঁটো করে দিয়েছে। আমি তখন আর একপাটি দাঁত নিয়ে টানাটানি করছি। না খুলতে পারলে কথা বলতে পারছি না, ক্ষমা চাইতে পারছি না। কী অপমানজনক ব্যাপার!

বিরোধী উকিল বলছেন, ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্পিটিং অন ইওর ফেস মিলর্ড। প্রমাণ করতে চায় আমি থুতু দিয়েছি জজসাহেবের গায়ে। কেস ঘুরে কনটেমপট অফ কোর্টের দিকে চলে যায়-যায়। তখন ফোকলা মুখে শুরু করলুম। ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে সেই কেসকে টেনে আনলুম আমার দিকে। তরি ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল। কী অপমানজনক ব্যাপার বল তো! ফেলে দে, ফেলে দে, ওই দাঁদানো দাঁত।"

দাঁদানো বাঁত? সে আবার কী? উত্তেজনায় বাঁধানো দাঁত বলতে গিয়ে দাদু দাঁদানো দাঁত বলে ফেলেছে। সেই দাঁত রাগ কমে যেতে দাদু পরেছিলেন। অভ্যাসও হয়ে গেল, কিন্তু দাঁদানো বাঁত আর বাঁধানো দাত হল না। চিরকালের মতো উলটে রইল। সোজা আর হল না। যখনই বলেন, ওই ব্যাপার আমার দাঁদানো দাঁত।

———

দাদুর ইঁদুর

"আজ শেক্‌সপিয়ারস!" বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা মোটা বই টেনে নিয়ে দাদু লাফাতে লাগলেন, "কাল সারারাত ধরে ব্যাটারা শেকসপিয়ার চিবিয়েছে।" বই যেখানে ছিল, সেইখানেই কুচো-কুচো কাগজ পড়ে আছে। দু-একটা টুকরো বইয়ের গায়ে লেগে ঝুলছে। "আর ক্ষমা করা যায় না। নো মারসি। এটা ধেড়েদের কাজ, নেংড়দের দাঁতে শেকসপিয়ার সইবে না।"

বইটার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে দাদু চিৎকার করলেন: "দেওকিনন্দন, এ দেওকিনন্দন।"

নীচের বাগানে যেন মেঘ ডেকে উঠল, "জি হাঁ।"

"তুরন্ত আ যাও।"

দাদু ডেকচেয়ারে বসলেন। চোখমুখ খুব ভীতিপ্রদ। "বুঝলে, পরশু মেটিরিয়ামেডিকা, তার আগের দিন রবীন্দ্ররচনাবলী, আজ শেকসপিয়ার। খিদে আর হজমশক্তি, দুটোই ক্রমশ বাড়ছে। মেটিরিয়ামেডিকায় ওষুধ আছে। নাকসভমিকার পাতা খেয়ে ব্যাটারা আগে খিদে বাড়িয়েছে।"

"ওষুধের নাম লেখা পাতা খেলেও ওষুধের কাজ হয় দাদু।"

"হবে না? সেই ঘটনার কথা তোমাদের মনে নেই? উত্তাল নদী পেরোতে হবে। নৌকো নেই। সাঁতার জানা নেই। শিষ্যের হাতে

গুরু একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললেন, একটা মুঠোয় ধরে হেঁটে পার হয়ে যাও। শিষ্য হেঁটে নদী পার হচ্ছে। সত্যিই সে ডুবছে না। মাঝনদী বরাবর এসে তার মনে হল, আচ্ছা দেখি তো কী আছে এতে। খুলে দেখলে, লেখা আছে রাম-নাম। যেই মনে হওয়া রামনামের এত জোর, বাস, ভড় ভড় করে ডুবে গেল।"

"মনে আছে, বাবা বহুবার আমাকে এই গল্প বলেছেন। তবে রামনামের জোর হিসেবে নয়, শিষ্যের বিশ্বাসের গল্প। গল্পটা শেষ করেন এই বলে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।'

'সেই বিশ্বাসে আমার কথাটাও তুমি মেনে নাও, তর্ক কোরো না। মেটিরিয়ামেডিকা বুকে চেপে ধরলে খাবি-খাওয়া রোগী বিছানায় উঠে বসে।'

'তা হলে এত মানুষ মারা যায় কেন?'

'বিশ্বাস নেই বলে।'

'তার মানে সেই বিশ্বাস।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আই হ্যাভ নো টাইম। আমার মন খারাপ। আমার শেকসপিয়ার খেয়ে গেছে।'

'জি হাঁ।' হাঁ হাঁ করে দেওকিনন্দন ঘরে ঢুকল। নীচের বাগানে একা-একা বোধ হয় কুস্তি করছিল।

মাথার পেছনে মাটি লেগে আছে। ভোজপুরি গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে আছে। দেওকিনন্দন সামনে থাকলে দাদুও গলাটাকে খুব গম্ভীর-মতো করার চেষ্টা করেন। দেওকির আদুরে নাম রেখেছেন দাদু দেবু।

'দেবু একটা ইদুরকল চাই।'

'জি হাঁ। লে আয়েগা। লেকিন জাঁতিকল কি খাঁচাকল?'

'জাঁতি নেহি, জাঁতি নেই। উ বীভৎস হ্যায়। খাঁচা মাঙতা।

'ঠিক হ্যায় জি, হো যায়েগা। লেকিন লেংটিকে লিয়ে কি ধেড়ে কে লিয়ে?'

'ইধার আও।'

দেওকি সামনে ঝুঁকে পড়ল। দাদু বইটার কুরে-কুরে খাওয়া অংশ দেওকির সামনে তুলে ধরলেন।

'এ কিসকা কাম?'

দেওকি ভাল করে দেখে বললে, 'ধাড়িয়াকা।'

'তব ধেড়ে কি লিয়ে খাঁচাকল লে আও।'

কল এসে গেছে। দাদুও এসে গেছেন কোর্ট থেকে। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ। দাদুর লাইব্রেরি ঘরে কলের কেরামতি চলেছে। দাদু নির্দেশ দিচ্ছেন। দেওকি করে যাচ্ছে।

'ময়দাকা এতনা ছোটা-ছোটা গোলি বানাও। ময়দা কি খায়েগা? সন্দেহ হ্যায়। লোভনীয় কুছ চিজ চাহিয়ে।'

আমি মেঝেতে থেবড়ে বসেছিলুম। বললুম 'কেক।'

'ওটা তোমার প্রিয়, ইঁদুরের প্রিয় হবে কি? কেয়া দেবু, প্রিয় হোগা?'

'লাডডু হোগা জি।'

'হাঁ হাঁ, লাডডু। লে আও।'

দেওকি সামনের দোকান থেকে এক টাকার লাডডু কিনে আনল। প্রথমেই একটা লাডডু আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, 'টেস্ট করো।'

মুখে দিয়ে বললুম, 'ভেরি টেস্টফুল।'

দেবুকে একটা দিলেন। 'ক্যায়সা?'

'বহত বড়িয়া।'

দাদু একটা খেলেন। 'হাঁ, মালুম হোতা হ্যায়, বড়িয়া।'

ঠোঙায় পড়ে আছে আর-একটা। দেওকি সেটাকে কলে পুরল। এখন কলটাকে কোথায় রাখা হবে? ইঁদুরের চোখে পড়া চাই। ইঁদুরের আবার চোখ কি! সর্বত্র তার চোখ। দেওকির পরামর্শে কলটাকে একটা বইয়ের র‍্যাকের তলায় রাখা হল।

ভীষণ ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। অন্যান্য দিন দাদুই আমাকে টেনে তোলেন। আজ আবার দাদুর কি হল। ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে সেই ফর্সা টকটকে মুখ দেখতে না পেলে কেমন যেন লাগে।

দাদুকে খুঁজে-পেলুম লাইব্রেরি-ঘরে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে আছেন। সামনে ইঁদুরকল। গোঁফঅলা এইটুকু ইঁদুর দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আশ্চর্য! কলের ভেতরের লাডডুটা সে চেয়েও দেখেনি। দাদুর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে দুঃখ-দুঃখ ভাব।

হাঁটুর ওপর হাত রেখে শরীরটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে ইঁদুরটাকে দেখছিলুম। এইবার থেবড়ে বসে পড়লুম।

'কী সুন্দর দেখতে দাদু।'

'বিউটিফুল।'

'গা-টা দেখেছ? তেল চুকচুকে। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বলে পুঁতির মতো। মুখটা কত বুদ্ধিমান।'

'অসাধারণ। এত কাছে থেকে ইঁদুর আমি কোনও দিন দেখি নি। বড় আদরের জিনিস হে।

'কী করবেন?

'সারারাত বেচারা না-খেয়ে আছে? একটা বিস্কুট আন তো।'

বিস্কুট নিয়ে এলুম। দাদু গুঁড়ো-গুঁড়ো করে কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ইঁদুরটা কাঁপতে কাঁপতে কোণের দিকে চলে গেল। বিস্কুট ছুঁলই না। দাদু বললেন, 'প্রাণভয়ে ভীত। কেমন বুঝতে পারে দেখেছ? জানে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।'

নীচে দেওকীর বাজখাই গলা শোনা গেল। দাদু কলটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। 'দেওকির হাত থেকে একে বাঁচাতে হবে খোকা। দেখলেই মারতে চাইবে। চল, বাগানের এক কোণে ছেড়ে দিয়ে আসি।'

দেওকির চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দু'জনে বাগানের পাঁচিলের ধারে এসে কলটা খুলতেই ইঁদুরটা বেরিয়ে এল! সঙ্গে-সঙ্গে তেড়ে এল এক ডজন কাক!

"তাড়াও, তাড়াও, গেল গেল!" দু'জনে হই—হই করে কাক তাড়াতে লাগলুম। কাকের পেটে যেতে যেতেও ইঁদুরটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। জল যাবার নর্দমা ধরে সোজা দৌড়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

'বাঁচ গিয়া। বাঁচ গিয়া। ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া।"

দাদুর ধেই ধেই নৃত্য। আমি দম বন্ধ করে ছিলুম এতক্ষণ। আমিও নাচতে লাগলুম। দেওকি বললে, "হুয়া কেয়া?"

দাদু বিজয়ীর মতো বললেন, 'বাঁচ গিয়া, বাঁচ গিয়া।'

'কৌন বাঁচ গিয়া জি?'

'চুহা। চুহা।'

দাদুর সে কি নাচ!

দাদুর দ্বিতীয় ছেলে

মাঝরাত দাদু একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। প্যানে যতটকু জল জমে থাকে, সেই জলে তিনি যেন সরু একটা মুখ দেখতে পেলেন। জিনিসটা কী, ঘুম-চোখে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। চোখে চশমা নেই যে, ভাল করে দেখবেন। চশমা ছাড়া আজ-কাল কাছের জিনিস আর দেখাই যায় না। পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। মুখটাই কেবল উঁচিয়ে আছে জলের ওপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছে জল ছেড়ে উঠে আসার।

দাদু ভাবছেন, কী রে বাবা! একবার জগদানন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে দোতলার বাথরুমের প্যান থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে উঠেছিল। জগাদানন্দ ভীতু মানুষ। ভয়ে শাওয়ারের ডাণ্ডা ধরে পাক্কা পনেরো মিনিট ঝুলে ছিল। অবশ্য জগদানন্দ মনে করেছিল ঝুলে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। মাটিতেই তার পা দুটো ছিল। দেহের ভারে পাইপ বেঁকে ধনুকের মতো নীচে নেমে এসেছিল। সাপ বিশেষ করে গোখরোর মতো রাজা-সাপ ভীতুদের ছোবল মারে না। একপাশে গোল হয়ে বসে জগদানন্দের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনছিল। সাপ যেন কী একটা পারে না। হয় শুনতে, না হয় দেখতে। সে যাই হোক, জগদানন্দকে বাথরুম থেকে কিছুতেই বেরোতে না দেখে সকলের সন্দেহ হল, হার্ট অ্যাটাক নয় তো? বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাকই বাথরুমে হয়। দরজাও ভাঙা যাচ্ছে না, জগদানন্দ বাঁকা পাইপ ধরে

দরজা ব্লক করে আছে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে অতি কষ্টে বললে, "বেঁচে আছি। কতক্ষণ থাকব জানি না। সাপ।" বাইরে থেকে সাহসীরা বললে, "সাপ তো কী হয়েছে, বেরিয়ে আসুন।" জগদানন্দ বেরোবে কী করে? বেরোবার পথ তো নিজেই বন্ধ করে বসে আছে। বাথরুমের কোণ থেকে দরজার মাথার ওপর দিয়ে শাওয়ারের পাইপ ছিল। সেই পাইপ এখন বেঁকে নীচে নেমে এসেছে। দরজা কোনও রকমে একটু খুলতে পারে। সে ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি গলবে না।

সেই জগদানন্দ আর বাথরুমে সাপের কথা ভেবে প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলেন। তারপর ওকালতি বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলে, ওটা সাপ নয়। সাপের সরু সরু গোঁফ থাকে না। তাহলে কী? সেপটিক ট্যাঙ্কে পোকা হয়। লাখ পোকা হয়। লাখ পোকা। সেই পোকা নয় তো? সর্বনাশ! লাখেলাখে সেই পোকা তেরে-মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নাকি? আঁতকে উঠলেন। আর একবার ভাল করে ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, চিনি গো চিনি, তুমি নেঙটি ইঁদুর। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে মানিক। মরতে ওখানে গিয়ে পড়লে কী করে? বেশ তো ছিলে আমার বইয়ের র‍্যাকে। যেখানে গিয়ে পড়েছ, সেখান থেকে তো আর উঠতে হবে না।

দাদু এক বালতি জল নিয়ে হুড় হুড় করে প্যানে ঢেলে দিলেন। চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন, আমার মূল্যবান বইসমূহ কেটে কুঁচি কাটা করলেও ঈশ্বর নির্বোধ প্রাণীর আত্মার সদ্‌গতি করে দাও। আসচে বার ও যেন পণ্ডিত হয়ে জন্মায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দাদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ আমি কী করে ফেললুম? আমার কী দরকার ছিল এক বালতি জল হুড় হুড় করে বাথরুমে ঢালার। পরোক্ষে আমিই হয়ে গেলুম ওই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ। একটা জীবন দিতে পারি না, একটা জীবন নিয়ে নিলুম। বিছানায় উঠে বসে আবার প্রার্থনা করলেন, "ঈশ্বর, এই নির্বোধ বৃদ্ধকে ক্ষমা করো প্রভু! ঝোঁকের বশে জল ঢেলে ফেলেছি। ও কি আর ওই গাড্ডা থেকে উঠতে পারত

প্রভু ? পারত না। তাই আমি জল দিয়ে ঢেইয়ে দিয়েছি। ওই অপবিত্র শরীতে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয় ? আমি নিজে যদি কখনও ম্যানহোলে পড়ে যাই, কথা দিচ্ছি, আমি বাঁচতে চাইব না। দমকলের লোককে গর্ত থেকে হেঁকে বলব, হোস দিয়ে আমাকে পদ্মার পাড়ে পাঠিয়ে দাও। সত্যি বলছি প্রভু। মিথ্যে নয়। তুমি আমাকে একবার ফেলেই দেখো।'

এত করেও দাদু শান্তি পেলেন না। ইশ, জলটা না ঢাললেই হত। আবার উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে একবার দেখে আসি। মুখটা বেরিয়ে আছে না কি! বেরিয়ে থাকলে আর জল ঢালব না। ওর নিজের বরাতের ওপরেই ছেড়ে দোব। নাঃ, সে বরাত করিনি আমি! কোথায় কী ? প্যানের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল। সেই ছুঁচলো মুখ অদৃশ্য। খুনের দায়েই পড়তে হল। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদালতে বিচার হবে। এখানকার আদালতে আমি মানুষের বিচার করি। সেখানকার আদালতে আমার বিচার হবে। বেলিফ হেঁকে বলবে, আসামি হাজির।

বিষণ্ণ মনে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। অনুশোচনায় ঘুম এসে গেল। নাক ডেকে উঠল ফুড়ুত ফুড়ুত। এদিকে তলিয়ে যাওয়া ইঁদুর আবার ভেসে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে এল ওপরে। অদম্য ইচ্ছা-শক্তি বাঁচতে আমাকে হবেই। বুড়োর লাইব্রেরিতে এখন হাজারখানেক বই। একেবারে টাটকা। দাঁত পড়েনি একবারও। ওই বইয়ের একটা পাতায় লেখা আছে, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার, হাঁসের মতো জল থেকে দুধটুকু টেনে নিতে হবে। আমি ইঁদুর। আমার আয়ু ওদের চেয়ে আরো কম। আমার শত্রু অনেক। বেড়াল, কাক, পেঁচা, সাপ, ইঁদুর-কল। কটা ইঁদুর আর স্বাভাবিকভাবে মরে! সবাই তো অপঘাতে শেষ হয়ে যায়। এই তো আমিই! এখুনি মরতে মরতে বেঁচে এলুম আমাদের ভগবানের জোরে।

ইঁদুরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত বারোটা থেকে

ক্রমান্বয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এখন প্রায় তিনটে। মানুষ হলে 'রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করেছি বলে গলায় পদক-টদক ঝুলিয়ে বসে থাকত। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসার অ্যাডভেনচার কাহিনী লিখে ফেলত। সিনেমা হত। হীরো বনে যেত। ইঁদুরের সংবাদ-পত্রও নেই, সাংবাদিকও নেই। একমাত্র উল্লেখ আছে সেই কবির লেখায়ঃ উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।

ইঁদুরও ক্লান্ত হয়, ইঁদুরেরও ঘুম পায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার ভেবে বাথরুমের ভেতরেই ইঁদুরটা একটা শান্তির জায়গা খুঁজতে লাগল। ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়? দাদু যে বালতি থেকে জল ঢেলেছিলেন, কলের তলায় সেই বালতিটা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। মানুষেরই মাথামোটা হয়, ইঁদুর বুদ্ধিমান হলেও কোনও কোনও ইঁদুর বেশ গবেট। একগুঁয়ে। গণ্ডার না হয়ে ইঁদুর হলে যা হয়। এই ইঁদুরটাও সেই রকম। ভেজা ইঁদুরও লাফাতে পারে। সেটা সহজেই বোঝা গেল। ইঁদুরটাও বুঝতে পারল। যখন সে তিড়িং করে লাফ মেরে ওই খালি বালতিটায় গিয়ে পড়ল। মূর্খ জানে না, বালতি বালতিই। বালতিটা খাট নয়! তার উপর মাথার সামনেই কল। সেই কল আবার খোলা। খোলাই থাকে। ভোর ছ'টায় জল এলে কেউ উঠুক না উঠুক বালতি ভরে থাকবে। শিয়রে শমন রেখে মানুষ ঘুমোতে না পারলেও ইঁদুর ঘুমোতে পারে। 'বাঃ কি সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের বাড়ি' বলে ইঁদুরটা এক পাশে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর বাথরুমের গোল আকাশ আহা। ইঁদুরটার তখনও একটা সন্দেহ ছিল, ভিজে ইঁদুর কি কিছু কাটতে পারে! তা না হলে আর একটু লাফিয়ে বেসিনে উঠলে দাদুর পা পরিষ্কার করার স্পঞ্জটা পেত, একটা ছোবড়াও ছিল।

ইঁদুর ঘুমুলে মানুষের মতই অসহায়। শেষ রাতে মানুষ গভীর ঘুমোয়, ইঁদুরও তাই। ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠলে ওই অবস্থা হত না। ঠিক ছ'টায় তেড়ে জল এল। ধোঁয়ার মতো। ইঁদুর নায়েগ্রাপ্রপাত দাঁতে কেটেছে হয়তো! তাতে তো আর ঠিক ধারণা

হয় না জিনিসটা কী ! পিড়ামিডওকাগজের মতো খেতে, নায়েগ্রা প্রপাতও কাগজের মতো। তফাত, কোনোটা আর্ট প্রিন্ট, কোনোটা হোয়াইট প্রিন্ট। এখন বুঝল নায়েগ্রা কাকে বলে। মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। একেই বলে ক্লাউড বার্স্ট। ছ' লিটার বন্যা। বালতির মাপ ছ' লিটার। ছ' লিটার জলে ইঁদুরের আবার হাবুডুবু। যেখানে জল পড়েছে সেখানে ঘুর্ণি। সেই আকর্ষণে বালতির কানা থেকে থাবা ছেড়ে যাবার মতো হচ্ছে। পেছনের পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। সামনের হাত দুটো দিয়ে বালতির কানা ধরে আছে। তোড়ে জল পড়ছে। ইঁদুরেরও মৃত্যুভয় আছে। কান দুটো পিছনে খাড়া। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোঁচা দৌড়লে মানুষের মুখ যে রকম সরু হয়ে যায়, এর মুখটাও তেমনি সরু দেখাচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার সময় দাদুই প্রথমে বাথরুমে ঢুকলেন। বেসিনে চোখ-মুখ ধুলেন। হাত দিয়ে অ্যা অ্যা করে জিভছুললেন। এই শব্দটা শুনলেই বুঝতে হবে প্রভাত হল। পাখি ডাকে। দাদু অ্যা অ্যা করেন। কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দাদুর নজর পড়ল। বালতিতে এটা কী রে ? অ্যা, সেই ইঁদুর। লোম-টোম ভিজে ছাল ছাড়ানো অবস্থা। আরে ছি ছি। তুই ব্যাটা প্যান থেকে উঠে এসে ফের বালতিতে পড়েছিস ! তোর দেখছি নির্ঘাত জলে ডোবার ফাঁড়া আছে ! একেই বলে মানুষের ভাগ্য। আমারও ওই রকম পতাকী যোগ ছিল। মাদুলি পরে বেঁচে আছি। তোর কোষ্ঠীও নেই। বাপ-মাও নেই। এতবড় এই বিরাট বিপদসঙ্কুল পৃথিবিতে এইটুকু একটা শরীর নিয়ে বাঁচা যায় ? তার ওপর অত্যাচারী। কেউ ভাল চোখে যে দেখবে, সে-পথও রাখেনি।

ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দাদুর মনে হল, সেই গল্পটা কত সত্যি। জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে তীরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করা। উদ্ধারের কথা মনে হতেই দাদুর আবার ভীষণ ঘেন্না এসে গেল। ইশ প্যান থেকে এসে মুখ ধোবার জলের বালতিতে পড়েছে। উত্তেজিত হলেই দাদুর ভাষা ভাবনা সব হিন্দিতে চলে যায়। ইসকো হাটাও, আভি হাটাও, সব বাহারমে ফেক দেও। রামখেলোয়ান, রামখেলোয়ান।

দাদু বাথরুমের দরজা খুলে নটরাজের মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন। সামনেই রামখেলোয়ান। হাতে তোয়ালে। ভেবেছিল বুড়াবাবু হয়তো তোয়ালে চাইছেন। দাদু বালতিটা দেখিয়ে বললেন, বিলকুল বাহার ফেকো।

দরজা পেরোলেই বাগান। দাদুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই রামখেলোয়ান পালোয়ানি শরীর নিয়ে এক ঝটকায় বালতিটা তুলে বাইরের বাগানে জলটা ফেলে দিল। পরিষ্কার তকতকে কচ্ছপের পিঠের মতো মাটি। চারপাশে জল গড়িয়ে গেল। রামখেলোয়ান জল ফেলে লাল বালতিটা করবী গাছের তলায় রাখতেই দাদুর খেয়াল হল, আরে বাইরে তো কাক আছে ওই তো পাঁচিলে বসে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, "কাঁহা ফেকা?"

রাম বললেন, বাহারমে ফেকিয়ে দিয়েছি, যেমুন বলিয়েছেন।'

"আরে মূর্খ, উসমে এক চুহা থা। কৌয়া লে যায়েগা। সর্বনাশ হো গিয়া।"

দু'জনেই উর্দ্ধশ্বাসে বাইরে ছুটলেন।

রামখেলোয়ান বললে, "আপ য্যায়সা বোলা।"

দাদু খুব রেগে বললেন, "হাম মুর্খ হ্যায় তো তোম গোমুর্খ হোগা।"

পরিষ্কার মাটি। ঘাসটার ঝোপঝাপ কিছুই নেই। জল পড়ে ভিজে ভিজে মাটি। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তিনটে কাক একটু আগে পাঁচিলে বসে ছিল। কাক তিনটে আর নেই। দাদু হায় হায় করে উঠলেন। "তোর জন্যেই প্রাণীটা বেঁচেও বাঁচল না। জলে ডোবা থেকে যদিও বা বাঁচল, কাকে নিয়ে গেল। পাষণ্ড, আভি নিকালো তোমাকে হাম নেহি মাঙতা।'

রামখেলোয়ান মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের রকে গিয়ে বসে রইল। দাদু নিজেই বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও নেই। আবার আমি। আমিই একটা প্রাণীর এতক্ষণের জীবন-সংগ্রাম শেষ করে দিলুম। আমি এক যমদূত। হে প্রভু, আমি যদি জলে ডুবি, তাহলে আমাকে কেউ যেন এইভাবেই তুলে বাঘের মুখে ফেলে দেয়। আমি

তোমাকে ষ্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিয়ে যাব। আমার ওই সাজাই হওয়া উচিত।

দাদু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বাড়ি ঢুকলেন। খুব মন খারাপ। পা ধুয়ে তোয়ালেতে পা মুছলেন। পাশেই বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথমে বাঁ পা ঢোকালেন। তারপর ডান পা-টা ভাল করে মুছে জুতোতে ঢোকালেন। ডগার দিকে নরম-মতো কী একটা নড়ে উঠল। শুধু নড়লই না। চিক্ করে আওয়াজ করে উঠল। পা বের করে উলটে-পালটে পা'টাকেই ভাল করে দেখলেন। মানুষের পা তো চিঁকচিঁক করে ডাকে না। তবে কি জুতো ডাকছে? জুতোর সামনে থেবড়ে বসে পড়লেন। সেই ইঁদুর। জুতোর ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

'রামখেলোয়ান, এই রামখেলোয়ান।" বাজখাই চিৎকার। একটু আগেই যার চাকরি গিয়েছিল, সে দৌড়ে এল। সারাদিনে বেচারার মিনিটে চাকরি যায়, আবার হয়। দাদুর নির্দেশে সে সাবধানে চটিটা তুলে নিল। দাদু বললেন, 'সামালকে, উসকা ভিতর সেই বীর চুহা হ্যায়। চলো।'

'কাঁহা চলেগা বড়া সাব।'

'তোমহারা ঘর। বাইরের দিকে রামের ঘরে, সেই ঘরে জুতোসুদ্ধ ইঁদুর থাকবে। একদম ডিসটার্ব করা চলবে না। সন্ধ্যের দিকে সুস্থ হয়ে নিজেই চলে আসবে দাদুর লাইব্রেরিতে।

সামনে রামখেলোয়ান চলেছেন জুতো হাতে। ভেতরে ভিজে ইঁদুর। পেছনে দাদু চলেছেন পাহারাদার। বলা যায় না, রাম যদি ফেলে দেয়। রাম বললে, "এ চিজ কাঁহাসে আয়া জি?'

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, "মুলুকসে।"

———

বড় মামার দাঁত

বড়মামা সাত সকালেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ তেমন সুবিধের নয়। এই সময় কেউ সুপ্রভাত বললে, খ্যাঁক করে উঠবেন।

পেয়ারের কুকুর লাকি, সুপ্রভাত জানাবার জন্যে সোফা থেকে নেমে এল, তড়াক করে। এতদিন কুকুরের সঙ্গে থেকে কুকুরের ভাষা বুঝতে শিখে গেছি। কুকুরের ভাষা ল্যাজে। মুখ দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে যা বেরোয় তার কোনও মানে নেই। মানুষ যখন ঢেকুর তোলে, তার কোনও মানে থাকে? একটাই মানে, পেট খুব ভরে গেছে। কুকুর কথা বলে ল্যাজে।

লাকি সামনের দু'পা তুলে ধেই ধেই করে নাচছে, আর পুটুক পুটুক ল্যাজ নেড়ে বলছে—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

বড়মামা লাকিকে ইংরেজিতে এক ধমক লাগালেন, স্টপ দ্যাট নুইসেন্স। বলেই মনে পড়ল জীবজন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই, তারা মানুষ নয়, ছাত্র নয়, কর্মচারী নয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলেন, সরি, সরি লাকি। লাকি চক চক করে হাত চেটে দিয়ে জানিয়ে দিলে, ক্ষমা করলুম।

বড়মামার ভুরু কুচকে আছে। আমার দিকে তাকালেন। এমন মুখ এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এ মুখ প্রধান শিক্ষকের হতে পারে, আমার বড়মামার কখনই নয়।

বড়মামা বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?

—বলুন।

—ওই সাজিটা নাও।

—ফুল তুলতে হবে?

—ব্যস্ত হয়ো না। ওয়েট। কি করতে হবে, আমিই ত বলব।

—না, সাজিতে ত ফুলই তোলে। তাই?

—বড়মামা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, তা হলে, তাই তোলো, আমার উপকার তোমাকে আর করতে হবে না।

—আচ্ছা বলুন, কি করতে হবে?

—এক সাজি কচি কচি পেয়ারাপাতা তুলে নিয়ে এসো।

— ছাগলকে খাওয়াবেন বড় মামা?

আবার প্রশ্ন!

বড়দের কথাবার্তা বোঝা দায়। এই বলবেন, যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ প্রশ্ন করবে। প্রশ্নের খোঁচা মেরে সব কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করবে। এই তো তোমাদের জানার বয়েস। আবার একবারের বেশি দুবার প্রশ্ন করলেই রেগে কাঁই।

এক সাজি পেয়ারাপাতা এনে বড়মামার টেবিলে রাখলুম। আমার কাজ আম করেছি লাকি এসে পরিদর্শন করে গেল। কুকুরের সঙ্গে বসবাস করে আমি নিজেও একটা কুকুর হয়ে গেছি। অগৌরবের নয়, গৌরবের কুকুর। কুকুরের বোঝা আমিও বুঝি। কুকুর চোখ দিয়ে দেখে না, দেখে নাক দিয়ে। আমাদের বোধশক্তি যেমন মাথায়, কুকুরের বোধশক্তি তেমনি নাকে। নাক দিয়ে পাতা দেখে কুকুর সরে গেল, লক্ষ্মী মেয়ের মত।

বড়মামা চোখ বুজিয়ে ভুরু কুচকে বসেছিলেন। পাতা এসেছে শুনে, চোখ খুললেন। বেলপাতায় শিবপুজো হয়। পেয়ারাপাতায় কি

পুজো হয়, কি জানি! মুখের যা চেহারা, প্রশ্ন করে জানার সাহস আর নেই।

বড়মামা টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছোলেন, তারপর মুঠো মুঠো পেয়ারা পাতা মুখে পুরে, চোখ বুজিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। এ আবার কি ধরনের আয়ুর্বেদিক ব্রেকফাস্ট! চিবোনো পাতা ফেলতে লাগলেন কাগজে। লাকি পাশের চেয়ারে প্রসাদের লোভে এসে বসেছিলেন। অবাক হয়ে, বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লাকি বিস্কুট বোঝে, মাংস বোঝে, এমন সাত্ত্বিক আহার দেখে তার হাসি পাচ্ছে। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি! বড়মামা বাগানের শামুকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে, চিবোনো পাতার একটা স্তূপ তৈরি করে ফেলেছেন।

লাকি ভৌ করে প্রশ্ন করলে, এ তোমার হচ্ছেটা কি?

হঠাৎ বড়মামার কোঁচকান ভুরু সমান হয়ে গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ ওঠার মত মুখে একটা হাসির ভাব খেলতে লাগল। যাক বাবা, বড়মামা এতক্ষণ পরে ফিরে আসছেন তাহলে!

চোখ খুলে বললেন, গোইং গোইং গন। চলে গেছে। প্রশ্ন করার সাহস ফিরে এল। কি হয়েছিল বড়মামা? গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল?'

—না।

—তা হলে শোঁয়া পোকা?

—আজ্ঞে না। দাঁতের যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। জব্দ করে ফেলেছি। ভেষজের কি গুণ দেখছিস? আমি ডাক্তারি ছেড়ে, এবার কবিরাজি ধরব। চরক সুশ্রুত। অ্যালোপ্যাথি বোগাস! কাল থেকে আমি মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেয়েছি। কিছুই হল না। পেয়ারা পাতার গুণ দেখ? দিশি দাওয়াই। বসবাস গাছে। তোরা সব সাহেব, বিলিতি করেই হেদিয়ে গেলি! আঃ মুখটা একেবারে ফ্রেস হয়ে গেল! মুখে যেন দুধের দাঁত ফিরে এলো।

মাসীমা চা নিয়ে এলেন।

বড়মামা বললেন, এই নে তোর জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি।

—কি আবার বাঁচালে ?

—পেয়ারা পাতা। তোর দাঁত কন কন করছে না ?

—শুধু শুধু দাঁত কনকন করবে কেন ?

—বলা যায় না কুসী, করতেও পারে। কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। চিবিয়ে রাখ চিবিয়ে রাখ। ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষের কাজ করা উচিত।

চায়ের কাপ রেখে মাসীমা চলে গেলেন। বড়মামার সারাদিনের সব উপদেশ পালন করতে হলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখটা কেমন যেন করলেন। আর এক চুমুক খেয়ে বললেন, যার সঙ্গে যে জিনিস! চায়ের সঙ্গে বিস্কুটটাই চলে। পেয়ারা পাতার সঙ্গে চা তেমন জমে না। গাছে গাছে কি শত্রুতা দেখ। চা-ও গাছ, পেয়ারা-ও গাছ, দু'জনে তেমন মিল নেই। সব মানুষের স্বভাব পেয়ে যাচ্ছে।

ধরাচুড়া পরে বড়মামা মিলের হাসপাতালে চলে গেলেন। যে কটা পাতা বেঁচেছিল, যাবার সময় পকেটে পুরে নিয়ে গেলেন। বলা যায় না, আবার যদি কন কন করে। দাঁত নাকি মানুষের চেয়েও অপরাধপ্রবণ। সারা জীবনে অনেক পাপ কাজ করে। পাঁঠা চিবোয়, মুরগীর ঠ্যাং ভাঙে, মাছের জীবন নাশ করে। দাঁতের সব কাজই হল নাশকতামূলক। একটাও গঠনমূলক কাজের দৃষ্টান্ত নেই। সারাজীবন খিঁচিয়ে গেল, চিবিয়ে গেল, কামড়ে গেল। আর পাপের বেতন কি ?

উত্তরে বললুম, মৃত্যু।

—রাইট। তাই মানুষের আগে দাত যায়।

নটার সময় বড়মামা গেলেন। খেলা শুরু হল, বেলা এগারোটা থেকে।

প্রথমে এলেন এক ভোজপুরী হিন্দুস্থানী। বিশাল চেহারা। স্যাণ্ডো গেঞ্জি। বুকের ওপর পেতলের পদক। বাজখাঁই গলা। গলা শুনে মাসীমা ভয়ে দরজায় আড়াল থেকে বললেন, কি চাই ?

—হাঁ, লিজিয়ে বলে দৈত্যের মত লোকটি, কাঁধ থেকে একগাদা

ডালপালা উঠনে ফেললেন। ডাগ্‌দার বাবুকে লিয়ে দাঁতন। কোঠারি আছে, কোঠারি ?

লোকটির গলা বড়মামার ছটা কুকুরের ছ'রকম ডাকে ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। মেজমামা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ; বারবার জিজ্ঞেস করছেন, কি হল কি, ডাকাত পড়েছে ? কি হল কি, ডাকাত পড়েছে ?

আমরা যত বার বলছি, না না দাঁতন এসেছে, কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না। অনেক কষ্টে শোনান গেল। তখন বললেন, বসতে বলো, বসতে বলো।

কোঠারি কি জিনিস মাসীমার মাথায় ঢুকছে না। কোঠারি ত অবাঙালীদের একটা পদবী। কোঠারী এ বাড়িতে আসবেন কেন। বড়মামার মিলের ম্যানেজারের নাম কোঠারি হতে পারে।

মাসীমা, বললেন কোঠারি সায়েব মনে হয় মিলে আছেন।

—নেহি, নেহি কাটনেকা কোঠারি।

—ওঃ হোঃ কাটারি।

লোকটি কাটারি নিয়ে বসে গেলেন নিম দাঁতন কাটতে। ছটা কুকুর চিল্লে কাবু হয়ে গেল। তিনটে বিরক্ত হয়ে তিন দিকে শুয়ে পড়ল, হাত পা ছড়িয়ে।

পাতা ছাড়িয়ে, সাইজ করে কেটেকুটে, বাণ্ডিল বেঁধে, মাল বুঝিয়ে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লেন। হাতে ঘড়ি, কাঁধে তোয়ালে। একটা দাঁতন চিবোতে চিবোতে, বাগানের রাস্তায় পড়ে বিকট সুরে গান ধরলেন, আরে এ রাম ভজুয়ারে। দাঁতনমুখে সে এক বিকট গান। ঘুমন্ত কুকুর তিনটে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, আবার চেল্লাতে শুরু করল।

আধঘণ্টা পরে ফেজ মাথায় এক ভদ্রলোক এলেন। মুখে চাপ দাড়ি। গায়ে চিকনের পাঞ্জাবি। তিনি এলেন স্কুটার চেপে। পেছনে একগাদা ডালপালা।

আমাকে দেখে বললেন, হাঁ লিজিয়ে জনাব ইয়ে ডক্‌টার সাবকে

লিয়ে। দোতলায় মেজমামাকে দেখে বললেন, সালাম আলেকুম প্রোফেসার সাব।

একের পর এক আসতে লাগল, গাবভ্যারেন্দা, আসশ্যাওড়া, নিসিন্দা। উঠনে একটা জঙ্গল তৈরী হয়ে গেল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি রে কুসী? আজ কি বনমহোৎসব?

—না, মেজদা বড়বাবুর দাঁতের যন্ত্রণা, এসব হল রুগীদের ভেট্। বড়দাকে ত চেন! যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই হয়ত বলছে, দাঁতের যন্ত্রণায় কি করা যায় বল ত?

—তা ডেন্‌টিস্টের কাছে যাচ্ছে না কেন? দাঁতের যন্ত্রণায় একমাত্র দাওয়াই উপড়ে ফেলা।

—দাঁড়াও, অতই সোজা! বড়দাকে চেন না। কবিরাজী হবে, হাকিমী হবে, টোটকা হবে, সন্ন্যাসী ধরবে, তন্ত্র হবে, তারপর একদিন উপড়ে আসবে। উনি ত ধাপে ধাপে উঠবেন।

মেজমামা বললেন, ওকে চিনিস না, ভীতুর ডিম। কাটা ছেঁড়া নিপাতন উৎপাটনের নাম শুনলেই বড়বাবু কাত। নিজের শরীরে ওসব চলবে না, সব চলুক পরের শরীরে।

লাকি এসে একটা নিসিন্দের ডাল সামনের দুপায়ে চেপে ধরে হাড়ের মত চিবোতে শুরু করলো।

॥ দুই ॥

বড়মামার দাঁতের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। ঠাণ্ডা জল সহ্য হচ্ছে না, গরম জলও নয়। কেবল বলছেন, বডি টেম্‌পারেচার। মাসীমা জল গরম আর ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা আর গরম করতে করতে পাগল হয়ে গেলেন।

খিঁচুড়ি ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য দাঁত নিচ্ছে না।

বসার ঘরে উপদেষ্টারা বড়মামাকে ঘিরে বসেছেন। তাঁদের চা চলছে, বিস্কুট চলছে, পাঁপড় ছলছে। বড়মামা শুধু দেখে যাচ্ছেন আর শুনে যাচ্ছেন। মাছে মাঝে দাতের গোড়ায় ক্লোভ অয়েল ঠুসছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, ওতে কিছু হবে না ডাক্তার দাওয়াই আছে আমার বড় বউমার কাছে। দাঁড়াও, এনে দি এক জালা।

রামবাবু বললেন, জিনিসটা কি শুনি ?

— তামাকের মাজন।

—ও, গুড়াকু। অতি বাজে জিনিস। ডাক্তার, খবরদার ওর কথা শুনো না। একবার ধরেছ কি মরেছ।

—হ্যাঃ তুমি সব জেনে বসে আছ ? মেয়েরা ব্যবহার করছে।

—সে ত মাতঙ্গিনী হাজরা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। তোমার বউমা বীরাঙ্গনা হতে পারে সবাই ত আর বীর নয়।

দু'জনে ঝটাপটি বাঁধে আর কি, বড়মামা উহু, উহু করে উঠলেন।

বসাকবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে বললেন, ডাক্তার গোড়ায় এক টিপ টিপে ধরো। একেবারে অব্যর্থ। আমাদের সাধন কি কষ্টই না পাচ্ছিল ! সারা ঘরে কেঁউ কেঁউ করে ঘুরছে আর বলছে, এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো। পকেট থেকে এই ডিবে, বের করে বললুম, এক টিপ লাগাও, চেপে ধরো দাঁতের গোড়ায়। দুম্ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, এ, জে র অ। বাঘের নাকে গুঁজে দিলে জঙ্গল ছেড়ে পালাবে। পরের দিন দেখি কি, মোল্লার চকে সাধন মাংসের দোকানে লাইন দিয়েছে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে, পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, মামাবাবু, আপনি ধন্বন্তরি।

অক্ষয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, তোমার মাথা। সাধন ওপর নিচে ষোলটা দাঁত তুলিয়েছে। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পারলেই হল।

রামবাবু বললেন ডাক্তার তুমি একবার কর্নেল বিশ্বাসকে দেখাও।

বসাকবাবু বললেন, সে হাত আর নেই, বয়েস হয়ে গেছে। দেখাতে হলে বোসই বেস্ট। সিক্সটিতে আমার আক্কেল দাঁত এক ছুরির

খোঁচায় এমন করে দিলে, বেরিয়ে এল, যেন খোল থেকে শামুক বেরলো।

রামবাবু বললেন, এটা কত সাল? এইটটি টু। বাইশ বছর আগের হাত আর এখনকার হাত!

অক্ষয়বাবু বললেন, গুপ্তকে দেখাও। ছোকরার যেমন গুণ্ডার মত চেহারা তেমনি অসুরের মত শক্তি। একটানে শেকড়বাকড় সব উপড়ে আনবে।

বসাকবাবু বললেন, পয়সা খরচ করে গুপ্তর কাছে যাবার কি দরকার, গুপে গুণ্ডার কাছে গেলেই হয়। দু চারটে গরম গরম কথা হল ফি। এক ঘুষিতে গোটা ছয়েক ঝরিয়ে দেবে।

সিদ্ধান্তে আসার আগেই সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা কুঁই কুঁই করতে করতে ঘরে চলে গেলেন। লাকিও চলল, পেছন পেছন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে। ল্যাজের ভাষা, কি করতে পারি, কি করতে পারি!

॥ তিন ॥

রাত আটটা নাগাদ অবস্থা চরমে উঠল।

দাঁতের গোড়া থেকে মন ঘোরাবার জন্যে, বড়মামা প্রথমে চালালেন ষ্টিরিও রেকর্ডপ্লেয়ার। প্রথমে শ্যামাসংগীত। হল না। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ। পরপর এলেন, চলে গেলেন। টপ্পা খেয়াল হার মানল। যাত্রাপালা, নটী বিনোদিনী। ওষুধ ধরল না। রাগপ্রধান কিচ্ছু হল না। এল ইংরিজি, অ্যাবা, ভেনচারম রনগডউইল ওসিবিসা বসি এম। কিছুতেই কিছু হল না। টিভিতে বাঙলাদেশ।

মেজমামা এসে বললেন, নিউক্লিয়ার অ্যাটাক ছাড়া ও মন ঘুরবে না। যা বলি শোনো। আমার সঙ্গে ডক্টর পালের কাছে চলো। কোনও ভয় নেই।

মাসীমা বললেন, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। বাচ্চা ছেলেও দাঁত তোলাতে ভয় পায় না।

মেজমামা বললেন, তোলার কথা আসছে কেন? তোলার হলে তুলবে, না হলে ওষুধ দেবে।

শিশুকে যেভাবে ভোলায়, সেইভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড়মামাকে ডক্টর পালের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে সাহস যোগাতে যোগাতে চললুম আমরা। মেজমামা মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। শরীর হল আত্মার পোশাক। আত্মা এমন এক বস্তু, জলে গলে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রে কাটা যায় না। গুপেগুণ্ডা কিছু করতে পারে না। দাঁত আত্মা নয়। দাঁত হল পোশাকেরই একটা অংশ। দু'চারটে গেলে কিছু এসে যায় না। শেষ বয়েসে দাঁত পড়ে যাবেই। ঠাকুরদার পড়েছিল, বাবার পড়েছিল, মায়ের পড়েছিল, আমাদেরও পড়বে। দাঁত কখনও আপনার জন হয় না। হলে যন্ত্রণা দিত না। ভাগনে যেমন কখনও আপনার হয় না, দাঁত সেইরকম।

আমাকে আর প্রতিবাদ করতে হল না। মাসীমা-ই এগিয়ে এলেন, মেজদা কথা যখন বলবে, একটু ভেবেচিন্তে, বুঝেসুঝে বলবে।

—কেন, কেন? অন্যায়টা আমি কি বলেছি? আমি শাস্ত্রের কথাই বলেছি। জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা।

—ওটা জন নয়, যম।

—তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস? জন মানে তৃতীয় ব্যক্তি, থার্ডপার্সন।

—আজ্ঞে না, ওটা যম।

আজ্ঞে না ওটা জন।

সারাটা পথ জনে আর যমে জমজমাট লড়াই চলল।

ডক্টর পালের চেম্বার একেবারে ভর ভরাট। কাঁচের শো-কেসে তিনপাটি দাঁত, হাসছে না খিঁচিয়ে আছে বলা শক্ত। দাঁত একবার মুখের বাইরে বেরিয়ে এলে তার ভাব আর ভাষা বোঝা দায়।

বড়মামা গাড়ি থেকে নেমে চেম্বারের সিঁড়িতে নেমে পা রাখতেই

ডাঃ গুপ্ত অ্যাপ্রন পরে ভেতর থেকে, বেরিয়ে এলেন, আরে ডাক্তার এসো, ডাক্তার এসো, কি সৌভাগ্য আমার।

লম্বা চওড়া, বিশাল চেহারা। আমেরিকার বাস্কেটবল প্লেয়ারদের মত চিউয়িং গাম চিবোচ্ছেন। হাতে এত লোম, মনে হচ্ছে ভাল্লুকের হাত।

বড়মামা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দাঁত নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তার।

—আরে ও তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার, ধরব আর টকাস করে তুলে দোব।

বড়মামা থেমে পড়লেন। করুণ গলায় বললেন, কুসী, এই দ্যাখ, কি বলছে?

মেজমামা সাহস দিলেন, আরে উনি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তুললেই হল? আমরা আছি না!

কোণের দিক থেকে গালফুলো এক রুগী নাকি সুরে ডাকলেন, ডাকতাঁর বাঁবু।

ডঃ গুপ্ত ডাকে কোনও সাড়া দিলেন না।

আমরা সদলে তাঁর ভেতরের চেম্বারে ঢুকে পড়লুম। দাঁত তোলার চেয়ারে বেল্ট বেঁধে একজনকে ফেলে রেখেছেন। বড়মামাকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, হাঁ করো, দেখি, কি অবস্থা করে এনেছ? আমাদের কাছে তো সব শেষের সময় হরিনাম করতে আসে।

বড়মামা হাঁ করলেন। ডঃ গুপ্ত টর্চের আলো ফেলে, লোহার একটা স্টিক দিয়ে দাঁত বাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত যদি জলতরঙ্গ, হত, এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত কনসার্ট। রসগ্রহণ করলেও দাঁত বড় নীরস।

বড়মামা হঠাৎ একসময় বাঘের মত আর্তনাদ করে উঠলেন, আঁউ!!

আ, হিয়ার ইজ দি কালপ্রিট। ব্যাটা, তুমি কোণে বসে কেরামতি দেখাচ্ছ। তোর একদিন কি আমার একদিন।

ভারি ওজন তোলার আগে মানুষ যেভাবে জোর নিশ্বাস নেয়, ডঃ গুপ্ত বুক চিতিয়ে সেইভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। বড়মামা করুণ মুখে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমরা সমস্বরে বললুম, কোনও ভয় নেই!

—তোমার ভয় করছে ডাক্তার! তা হলে ছাখো।

হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে চেয়ারের লোকটির দিকে তেড়ে গেলেন। পেছন দিক থেকে তার মাথাটা চেয়ার-এর উঁচু হেডরেস্টে ঠেসে ধরে, মুখে যন্ত্র পুরে ডালাখোলা বাকসের মত হাঁ করিয়ে দিলেন। পাশের ট্রে থেকে চকচকে সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁত চেপে ধরলেন। কড়াক করে একটা শব্দ হল।

বড়মামা শিউরে উঠে চোখ বুজলেন। কড়ড় মড়ড় শব্দ হতে লাগল আর ডাক্তার রেগে রেগে বলতে লাগলেন, সব শেষ সময়ে এসে মরবে, আসবে একেবারে বারোটা বাজিয়ে।

প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। লোকটির শরীর টান টান হয়ে গেল। সাঁড়াশির মুখে ধরা বর্শার ফলার মত দাঁতের অংশ আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

দাঁতটা ঠকাস করে একটা ডিসে ফেলে দিয়ে, মুখে ফ্যাসফ্যাস করে খানিকটা ওষুধ স্প্রে করে দিয়ে, চেয়ার থেকে লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি সামনে কুঁজো হয়ে, টলতে টলতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ডঃ গুপ্ত বললেন, কি বুজলে ডাক্তার?

বড়মামা চোখ ঢেকে বললেন—উঁ।

—এ সব আমাদের কাছে জল ভাত। দাঁত একটা জিনিস! ধরো আর ফেলো। নাউ, কাম হিয়ার।

বড়মামার চোখমুখ ছাইবর্ণ। আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। পরীক্ষা-টরিক্ষা করে ডাক্তার পাল বললেন।

দাঁড়াও, একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে ব্যথাটা আগে কমাই। দাঁতটার অবস্থার তেমন ভাল নয় হে। ভেতর ভেতর বেশ বিগড়ে বশে আছে।

মাড়ির পাশে পাশে পুট্‌পুট্‌ করে কয়েকবার ছুঁচ ফুঁড়লেন ডাক্তার-বাবু। ইন্‌জেক্‌শানেও বড়মামার ভয়! সিটিয়ে আছেন।

ইন্‌জেক্‌শান শেষ হতেই বড়মামা বললেন, চলি তা হলে?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ডাক্তার! একটু বসে যাও। সারারাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দু'দশ মিনিট বসে যাওয়া ভাল। তুমি ওই ডেক চেয়ারে বোসো।

বড়মামা বসলেন। ডঃ পাল চেয়ারে টেনে আনলেন এক মহিলাকে। সেই এক ব্যাপার। দাঁত, আর দাঁতের মালিককে ধমকধামক চলল। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। মুখে যন্ত্র পোরা। ডাক্তারবাবু সাট্ করে এক টান মেরেই ইস্ ইস্ করে উঠলেন। তারপর ভদ্রমহিলার দাঁতের সারি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে আর একটা দাঁত তুলে আনলেন।

মহিলা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ডাক্তারবাবু বললেন, বুঝলে ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়ার এই দোষ, যার তুলছি সেও বোঝে না কি তুলছি, যে তুলছে সেও বোঝে না কি তুলছে! ইস্, মহিলার একটা ভাল দাঁত টেনে তুলে দিয়েছি।

বড়মামা বললেন, আমি এবার উঠি ডাক্তার।

—উঠবে, উঠবে। জিভ দিয়ে ছাখো তো দাঁতের চারপাশটা বেশ অসাড় হয়েছে কি না!

বড়মামা বললেন, জিভ নাড়তে পারছি না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল আর কি হবে?

—তাই নাকি! কই দেখি, চেয়ারে একবার বোসো দেখি, একটু রুট ক্যানাল ট্রিটমেণ্ট করে দি। অসাড়ে ভাল হলে ত হবে না, সাড়ে ভাল হতে হবে ত।

বড়মামা চেয়ারে বসলেন।

মেজমামা আর মাসীমা দু'জনে ফিস্ ফিস্ করলেন। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। চোখে চোখে আঙ্গুলের ইশারায় কোন একটা পরিকল্পনা পাকা হতে চলেছে। এর মধ্যে একজন কিছুই জানে না, বাকি সবাই জানে। ঘরের বাতাস উৎকণ্ঠায় থম থম করছে। যে কোনও মুহূর্তে একটা খুন হবে। মানুষ নয়। খুন হবে একটা দাঁত। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বড়মামা, পালান।

ডঃ পাল বললেন, দেখি হাঁ কর তো ডাক্তার।

বড়মামা হাঁ করলেন।

আমার চোখ ডক্টর পালকে অনুসরণ করছে। তাঁর ডান হাতটা ধীরে ধীরে দাঁত তোলা সাঁড়াশির দিকে সরছে। অনর্গল কথা বলে চলেছেন, বড়মামাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। ধীরে ধীরে সাঁড়াশিটা হাতে তুলে নিলেন। বড়মামাকে মাথার পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন হঠাৎ।

উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সাঁড়াশি উঠতে উঠতে বড়মামার ঘাড় পর্যন্ত উঠেছে।

আর পারলুম না। 'বড়মামা, সাবধান!' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

আমার চিৎকারে, আর দাঁত তুলে দেবার আতঙ্কে, বড়মামা একেবারে জেমস বণ্ডের মত হয়ে গেলেন। চেয়ার চরকিপাক খেল। কি হচ্ছে বোঝার আগে বড়মামা বাঘের মত লাফিয়ে উঠে সুইংডোর ঠেলে একেবারে রাস্তায়।

বড়মামা ছুটছেন, দু হাত পেছনে আমি ছুটছি। আমাদের পেছনে ধরধর করে ছুটে আসছেন সাঁড়াশি হাতে ডেনটিস্ট, মেজমামা কয়েকজন পেশেন্ট। প্রাণভয়ের দৌড়ের সঙ্গে মিলখা সিংও পাল্লা দিতে পারবেন না।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে, হাইওয়ে পেরিয়ে আমরা শুকচরে ঢুকে পড়েছি। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ, হেডলাইটের আলো ভেসে এল। বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার গাড়ি চেপে আমাকেই ধরতে আসছে! কুইক্, নেমে পড়ো ওই মাঠের ঝোপে।

সাপের ভয় নেই, ব্যাঙের ভয় নেই। আমরা দুজনে ঝোপের মধ্যে। ওপরের রাস্তা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বড়মামার গাড়ি। বড়মামা, ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তুই আমাকে বাঁচালি। মেজোকে বলিস, ভাগনেই একমাত্র আপনজন।

বড়মামা, আপনার দাঁত?

দাঁত? দাঁত এখন মুখ ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে রে।

বড় মামার মেজাজ

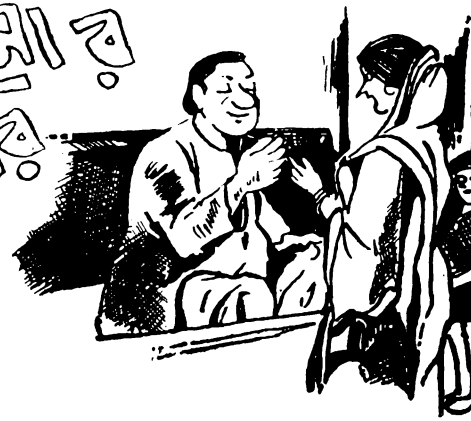

হাড়ের নস্যির ডিবে। আগে কখনো দেখিনি। পুরী থেকে স্পেশাল আমদানি। বড়মামার এক রোগী পুরী থেকে এনে প্রেজেন্ট করেছে, পুরস্কার। ভদ্রলোক একদিন বেদম হাসছিলেন। চোয়াল আটকে হাঁ হয়ে গেল। কোনো ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না। শেষে বড়মামা। বড়মামা সেই সময় বাড়িতে সিল্কের লুঙ্গি পরে পেয়ারের কুকুর লাকিকে ওঠ-বোস করাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক হাঁ করে রিক্সা থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বড়মামাও হাঁ। ভদ্রলোকের বাড়িতে সেদিন মাংসের ঝোল হয়েছিল। চোয়াল আটকে গেলে খাওয়া যায় নাকি? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝোল জুড়িয়ে জল। এখন শেষ ভরসা বড়মামা।

লাকিও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে হাঁ। আশে পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও হাঁ। বড়মামা মিনিট খানেক কি ভাবলেন! তারপর ঠেসে এক চড় ভদ্রলোকের গালে। খুট্ করে একটা শব্দ হল। এক মুখ হাসি। বড় মামাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! বড় মামা যত বলেন, 'ছাড়ুন ছাড়ুন, কাতুকুতু লাগছে', আদর যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে! শেষে লাকি যখন রেগে গর গর করে উঠল ভদ্রলোক তাঁর উচ্ছ্বাস সংযত করলেন।

'মশাই, পাঁচকড়ি বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে আমার মাংস আমারই

চোখের সামনে খেয়ে যাবে, বলুন সহ্য করা যায়!' পাঁচকড়ি ভদ্রলোকের বেকার ভাই। বড়মামা বললেন, 'আজকের দিনটা লিকুইড খেলেই ভাল হয়।' 'লিকুইডই তো, মাংসের ঝোলটাই তো বেশি, পাঁচশো মাংস আর ক'টা টুকরো বলুন। ঝোলের সঙ্গেই গিলে নেবো।' কড়কড়ে আটটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েই পাঁচকড়ির দাদা সাতকড়ি রিক্সায় উঠলেন। চড় মারার ফি। সেই সাতকড়ি বাবুই নস্যির ডিবেটা দিয়েছেন।

নস্যির ডিবেটা সিল্কের লুঙ্গি দিয়ে পালিশ করতে করতে বড় মামা বললেন, 'তুই আমার কাছে শুবি। ফাস্ ক্লাস তিন তলার ঘর। বড় বড় জানালা। ফুর ফুর করে হাওয়া খেলে যাচ্ছে। দুজনে মজা করে পাশাপাশি শোবো। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো।' বড় মামা এক টিপ নস্যি নিলেন সশব্দে। মেজমামা জানালার কাঁচ পালিশ করছিলেন। মেজ মামার হল পরিষ্কার বাতিক। সব সময় কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছেন। আসা-যাওয়ার পথে এটা ওটা সেটা ঝাড়ছেন। সিঁড়ির হাতল, খাটের মাথা, টেবিল, ফুলদানি। তখন পড়েছিলেন জানালার কাঁচ নিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোবে শোও, তবে অপঘাতে মরলে আমাদের দোষ দিও না।' আমি অবাক হয়ে বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বড়মামা ইসারায় নিজের মাথার উপর একটা আঙুল বার কতক গোল করে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মেজোর মাথার গণ্ডগোল আছে। জানলার কাঁচে বড় মামার হাত ঘোরানো মেজোমামা দেখতে পেয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমার মাথার গোলমাল তো হবেই, তোমার মাথাটা খুব ঠিক আছে, তাই তো! বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছো। ছটা গরু, কোনোটার দুধ নেই। খাচ্ছে দাচ্ছে, নাদা নাদা হাগছে। মশার চোটে বাড়ি টেঁকা যাচ্ছে না। চার চারটে কুকুর, ঠাকুর ঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে একঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে।' বড়মামা খুব রেগে গেলেন, 'তাতে তোর কি, তোর কি অসুবিধে হয়েছে?' মেজমামার কাঁচ

পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল, 'আমার কি ? আমার কি তাই না ? তোমার লাকি সকাল বেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝাপটা মেরে আমার চোখের চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বড়মামা আবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'লাকি, লাকির পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগ সোপ মেখে চান করে। তুই তো সাত জন্মেও চান করিস না।' মেজোমামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপরই বিস্ফোরণ—'ওঃ গোলাপ জল তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পার তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে। কার্পেট তুমি পরিষ্কার করবে, আমি পারবো না।'

'আমার সময় কোথায়, জানিস আমার গর্জমান প্র্যাক্‌টিস।' বড়মামা রোরিং-এর বাঙলা করলেন গর্জমান। প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন বাংলা বলবেন 'পিওর বাংলা' যখন ইংরেজী তখন 'খাঁটি ইংলিশ'।

'তোমার প্র্যাকটিস আমার জানা আছে, যত চড়-চাপড় মেরে বুদ্ধু লোকের কাছ থেকে টাকা বাগাও।' মেজমামা সেই সাতকড়ির চোয়াল আটকে যাবার কেসটা বললেন।

'তুই ডাক্তারির কি বুঝবি। একি তোর ফিলজফি!' বড়মামা মেজোমামার দর্শন নিয়ে এম, এ, পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

'তোমার গরু যদি কাল আমার বাগানে ঢোকে, আমি খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবো।' মেজো মামা এইবার গরু দিয়ে বড়মামাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন।

'ঠিক আছে, খাঁটি ক্ষীরের মত দুধ হলে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো।' বড় মামা লোভ দেখালেন।

'দুধ!' মেজমামা একখানা নাটকীয় হাসি ছাড়লেন। 'কার দুধ ? লক্ষ্মীর দুধ! ওর পেটে দুধ ভরে বাঁটের কাছে একটা কল ফিট করে দিলে তবে যদি দুধ পড়ে, বুঝেছো ? ছ' বছরেও যে দুধ দিলে না, তার

দুধ তুমিই খেও। ডুমুরের ফুল দেখেছো, সাপের পা দেখেছো, সোনার পাথর বাটি দেখেছো, কুমিরের চোখে জল দেখেছো?' মেজমামা মনে হয় উপমার বন্যা বইয়ে দিতেন যদি না সেই সময় ঘরে ছোটো মাসী ঢুকতেন!

ছোটো মাসীর হাতে একটা শাড়ি। মেজাজ একেবারে সপ্তমে। 'বড়দা এটা কি হয়েছে?' শাড়িটার একটা দিক টুকরো টুকরো। মনে হয় কেউ চিবিয়েছে। বড়মামা নস্যির ডিবেটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ছিঁড়ে ফেলেছিস?'

বারুদে যেন আগুন লাগলো, 'আমি ছিঁড়েচি! তোমার খরগোসের কীর্তি।'

'যাঃ, খরগোসে তোর শাড়ি চিবোতে যাবে কেন?' বড় মামার অবিশ্বাস।

'যাবে কেন? তোমার খরগোস কোনো কিছু আস্ত রেখেছে। স্টেনলেস স্টিলের বাসনগুলোও চেষ্টা করেছিল, পারেনি।' মেজমামা মনে হল বেশ খুশী। মেজমামা বললেন, 'খরগোসের পেটে সব কিছু যাবার আগে রোস্ট করে ওগুলোকে পেটে পুরে দে।' বড়মামা যেন শিউরে উঠলেন। 'কাপড় তুই যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস কেন, কেয়ারলেসের মত?' 'যেখানে সেখানে!' মাসীমা তেড়ে এলেন, 'বাসকেটে রেখেছিলুম ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে, সেখানে গিয়ে ঢুকেছে শয়তানগুলো।' 'বাসকেটে কেউ কাপড় রাখে?' বড়মামা দোষটা মাসীমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন। 'ছাড়া কাপড় বাসকেটেই রাখে বড়দা, চিরকাল তাই রাখা হয়।' বড়মামা হালকা চালে বললেন, 'আর রাখিসনি। ছাড়া কাপড় একটু উঁচুতে রাখিস।' 'কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবো, কিম্বা মাথায় করে নিয়ে ঘুরবো এবার থেকে।' মাসীমা রেগে বেরিয়ে গেলেন।

মেজমামার আবার আক্রমণ, 'তোমার খরগোস সেদিন আমার চটি জুতো খেয়েছে। বলো, চটি এবার থেকে মেঝেতে খুলে না রেখে মাথায় করে ঘুরে বেড়াস!' বড়মামা ফাইন্যালি এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,

'দেখ মেজো, আমার বাবার বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করতে পারি, তোমার পছন্দ না হয় আমার কিছু করার নেই। গরু আমার থাকবে, কুকুর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বেটার ছ্যান মেন, পাখি আমার দাঁড়ে ঝলবে, খরগোস আমার নেচে নেচে ঘুরবে। পৃথিবীর পশু জাতি আমার বন্ধু, আমার ফ্রেণ্ড।' মেজমামা কি বলবেন একটু যেন ভেবে নিলেন, তারপর ছাড়লেন তাঁর উত্তর, 'বাড়িটা তোমার একলার নয়, বুঝেছো। জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে একটু মিলে মিশে থাকতে হয়। এরপর তুমি একটা কেঁদো বাঘ আমদানি করবে, তারপর একটা বিটকেল ভাল্লুক। এক-দিন বাড়ি ফিরে দেখলে আমরা সব ক'টা চলে গেছি পেটে, হাড় ক'খানা পড়ে আছে। তোমার বাঘ ভাল্লুক বসে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তখন কি হবে! বলো কি হবে!'

'ঘোড়ার ডিম হবে, বড়মামার নির্বিকার উত্তর। বাঘ ভাল্লুক কেউ পোষে না, কথার কথা বললেই হল, না! আসলে তোরা ভীষণমিন মাইণ্ডেড, আত্মসুখী, তোদের কোনো ক্যারেকটার নেই।'

'কি বললে? আমরা চরিত্রহীন! তোমার ভারি চরিত্র আছে, না? জোচ্চোর ডাক্তার। তুমি আর কথা বোলো না। রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন জানো, 'ডাক্তার আর উকিলরা কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' মেজমামা এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলে গেলেন। বলে যেন বেশ তৃপ্তি পেলেন।

বড়মামা এক টিপ নস্যি বেশ সশব্দে নাকে গুঁজে বললেন, 'পশুপক্ষী নিয়েই আমি থাকবো। তোরা হলি বিষাক্ত সাপ। তারপর আমাকে বললেন' 'তুই আমার একমাত্র ভাগ্নে। তুই এইসব নোংরা আদমীদের সঙ্গে একদম থাকবি না, আমার তিন তলার ঘরে আরামে ফুরফুরে হাওয়ায় আমার পাশে ঘুমোবি, সকালে আমার সঙ্গে বেড়াবি। বিকেলে লাকির সঙ্গে খেলবি।' মেজমামা কান খাড়া করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, 'ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাব। তুমি বেচারাকে তিন-তলার ঘরে পুরে সারা-

রাত ফুটবল খেলবে, তা হবে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আই প্রোটেস্ট।'

'তোর প্রোটেষ্ট!' বড়মামা হাসলেন, 'তোর মত অমানুষের হাতে একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

অমানুষ বলায় মেজমামা ফিউরিয়াস। 'অমানুষ কাকে বলে জানো? পশুদের কাছাকাছি যারা থাকে তারাই অমানুষ। পশুদের নিয়ে এ বাড়িতে কে থাকে? তুমি থাকো। সুতরাং অমানুষ তুমি, আর তাই ছেলেটা তোমার হেফাজতে যাতে চলে না যায়, আমাদের দেখতে হবে!'

এইবার বড়মামা হাসবার পালা, 'তুই দেখবি! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই দেখবি! তুই সারা বাড়ির ধূলো আর নোংরা ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাস না, আগের জন্মে বোধহয় ধাঙড় ছিলিস।' মেজমামাও ছাড়বার পাত্র নন, 'তোমার মত অপদার্থরা বাড়িতে থাকলে আমাদের মত পদার্থওয়ালাদের তো খাটতেই হবে। তোমার পাখি, তোমার পেয়ারের কুকুর, তোমার শুকনো গরু, তোমার বোকা রুগীর দল চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িটাকে ডাষ্টবিন বানিয়ে যাচ্ছে। আমি আছি বলে বাস করতে পারছো, চলে গেলে বুঝবে ঠ্যালা। Cleanliness is next to Godliness, বুঝেছো। আমি হলুম সেই God',

'God!' বড়মামার বিস্ময়। 'তুই হলি গিয়ে God আর আমরা হলুম Demon', বড়মামার সে কি প্রাণখোলা হাসি। 'গায়ত্রী জপ করতে জানিস? গলায় তোর পৈতে আছে? সেটাকে তো বহুকাল ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই মাসীর তাড়া খেয়ে সবচেয়ে বড় খরগোসটা, যেটাকে আমরা পালের গোদা বলি, সেটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ফেদার ডাষ্টার তুলে সেটাকে পেটাতে যাচ্ছিলেন। বড়মামা খরগোসটাকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই যে God, জীবে দয়া করার কথাটা বুঝি তোর শাস্ত্রে লেখা নেই! শুধু জিভে দয়াটাই বুঝেছিস, না?'

বড়মামা এক বগলে খরগোস অন্য বগলে আমাকে নিয়ে বাগানে

চলে এলেন। বড়মামা জুট মিলের ডাক্তার। মিলের দুটো জোয়ান ছেলে বড়মামার চাকর কাম এডি-কং কাম কনফিডেনসিয়াল এডভাইসার। একজনের নাম রতন আর একজনের নাম প্রফুল্ল। রতনের মুখের ডানদিকে একটা গভীর কাটা দাগ লম্বা হয়ে ভুরুর কাছ থেকে দাড়ি অবধি নেমে এসেছে। মিল এলাকায় কে যেন ছোরা মেরেছিল বছর ছয়েক আগে। বড়মামা খুব জোর চোখটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রতনের ভগবান বড়মামা। প্রফুল্লরও তাই। প্রফুল্লর একবার কার্ডিং মেশিনে হাত ঢুকে প্রায় ছিঁড়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামা খুব কায়দা করে জোড়া তালি মেরে হাতটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজমামার সখ ফুল বাগান। বড় মামার ফল বাগান। রতন আর প্রফুল্ল তার মালি। শ'খানেক নারকেল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কেরালার গাছ। মাথায় বেশি বড় হয় না। ছোটো ঝাঁকড়া গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব নেমে এসেছে। রতন তারই একটায় উঠে, পাতার আড়ালে ঢুকে ছিল, পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্ল ছিল বাগানে। কোদাল পেড়ে মাটি কোপাচ্ছিল। বড়মামার বাগানে আসা মানে তিনটে কুকুরও পেছন পেছন এসেছে। এর মধ্যে লাকি সবার আগে, কারণ সে হল পেয়ারের কুকুর। তার সাত খুন মাপ।

বড়মামা বললেন, 'ওই দ্যাখ, রতন তোর জন্যে ডাব পাড়ছে। এক একটা ডাবের কতটা জল জানিস, ফুল দু গেলাস, আর ইয়া পুরু নারকেল। তোর মেজমামার ক্ষমতায় কুলোবে, পারবে তোকে কেরালার ডাব খাওয়াতে? ওই তো ওর বাগানের ছিরি ক'টি দোপাটি, কলা ফুলের ঝাড়! ফুলের ঝাড় 'প্রফুল্ল'—বড়মামা হাঁক ছাড়লেন। প্রফুল্ল কোদাল ফেলে, মিলিটারিকায়দায় এগিয়ে এল, 'শোন, শিগগির মোল্লার হাটে চলে যা, দু কেজি ফাস্ ক্লাশ মাংস নিয়ে আয়, আর আনবি দই। জানিস কে এসেছে, হামারা ভাগনে।' প্রফুল্ল দৌড়োলো হুকুম তামিল করতে। বড়মামার এক মুখ হাসি, 'এখান থেকে যখন ফিরে যাবি, ওজন চার কেজি বাড়িয়ে তবে ছাড়বো। তোকে মালটি ভিটামিন

খাওয়াবো, ফেরাডল খাওয়াবো, বোতলে ভরা নেবুর রস খাওয়াবো, দুধটা এবার খাওয়াতে পারবো না গরুগুলো খুব শয়তানি করছে।' তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'মেজোটার নজর লেগে দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তার বদলে তোকে মোল্লার চকের দই খাওয়াবো।'

রতনের দাঁতে ছুরি, কোমরে দড়ি বাঁধা, হনুমানের লেজের মতো ঝুলে এসেছে। কাঁদি কাঁদি সবুজ ডাব দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

মেজমামার যে কেন ঠিক এই সময়ে বাগানে আসার দরকার পড়ে গেল কে জানে। মেজমামার আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। বিশেষত বড়মামার ব্যাপারে। দোপাটি গাছের চারায় বাঁশের কঞ্চির গোঁজ দিতে দিতে কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন বোঝা গেল না, 'এরা সব দেশের শত্রু, কচি কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। এদের জেল হওয়া দরকার। কেরালায় কচি ডাব পাড়া সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুনো হলে নারকেল হয়, ছোবড়া হয়। দেশের কাজে লাগে। তা না, বাবুরা ডাবের জল খাবেন। ডাবের জলে কি আছে! ঘোড়ার ডিম আছে!'

বড়মামা বেশ বড় করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'বুনো ফুল গাছ করেছিস, তাই নিয়ে থাক। ডাব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ডাব আমি বুঝবো।'

'তোমার ডাব মানে? গাছ আমাদের সকলের। জানো, তুমি কি অনিষ্ট করছ? দেশের কত বড় ক্ষতি করছ? নারকেল শুকিয়ে 'কোপরা' হয়, সেই 'কোপরা' থেকে নারকেল তেল হয়। নারকেল তেলের কিলো জানো?'

'যা যা, তোর কোপরা আর তেলের নিকুচি করেছে। ডাবের জল খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়।' বড়মামা একটা কাঁদির গাছে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন। মেজমামা বললেন, 'মাথা জোড়া যার টাক, সে আর তেলের কি মর্ম বুঝবে! ছোবড়া থেকে কতরকম শিল্প হয় জানো? বিদেশে রপ্তানি করে কত টাকা রোজগার করা যায় জানো?'

'আমার জেনে দরকার নেই। আমাতে আর আমার ভাগ্নেতে

মিলে গেলাস গেলাস জল খাবো, দুরমো নারকেল খাবো ফুলো ফুলো মুড়ি দিয়ে।'

মেজমামা আগাছা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'তাই নাকি? বার করছি তোমাদের ডাব খাওয়া, আমি কোট থেকে ইনজাংসান দেওয়াবো।'

'ইনজাংসান!' বড়মামা হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন, 'পাগলের পাগলামি বাড়িতে চলে বুঝেছিস্, কোর্টে চলে না। ঘাস ওপড়াচ্ছিস ওপড়া, অন্যের চরকায় তেল দিতে আসিসনি।'

রতনের উপর হুকুম হল, 'যা, সমস্ত ডাব তেতলায় আমার ঘরে খাটের তলায় নারকোল পাতা বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে আয়। আর এখন থেকে বলে রাখছি তোর মেজবাবু যদি কোন দিন বলে, রতন পেট-গরম হয়েচে রে, একটা ডাব কাট তো। সোজা বলে দিবি বাজারে গিয়ে খেয়ে আসুন। গাছের ডাব একটাও দিবি না। আমাকে আইন দেখাতে এসেছে, কোর্ট দেখাতে এসেছে!'

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো কে জানে, হঠাৎ বড়মামার এক রোগী এসে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে নাকে ন্যাপথালিনের বল ঢুকিয়ে ফেলেছে। বড়মামা প্রথমে পাত্তা দিতে চান নি। ন্যাপথালিন আরে ভালই তো, আস্তে আস্তে উড়ে যাবে, ভয়ের কি আছে।' ছেলের মা নাছোড়বান্দা, উড়ে যেতে যেতে ছেলের এদিকে প্রাণ যায়, নিঃশ্বাস নিতে 'পারছে না।' হাতের কাছে ওসব রাখো কেন' বড়মামার ধমক। উপায় কি না রেখে। আমাদের যে ন্যাপথলিনের কারবার! সারা বাড়িতেই ছড়ানো।' বড়মামা বললেন, 'তাহলে বাড়িতে তো সব সময় একজন ডাক্তার রাখা উচিত, যেই বের করে দিয়ে আসবো পেছন ফিরতে না ফিরতেই তো আবার ঢোকাবে।' ছেলের মা করুণ গলায় বললেন, 'আর একবার ঢুকিয়েছিল, নাকে চিমটে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছিলুম, এবার আর বেরোচ্ছে না, আপনি একটু দয়া করুন, ছেলেটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বড় হলে তারপর আনবো।'

পাড়ার কলে বড়মামা সিলকের লুঙ্গির উপর একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি

পরেই বেরিয়ে পড়েন। রতন পাঞ্জাবি আর ডাক্তারী ব্যাগটা নামিয়ে আনলো। বাড়িরই সাইকেল রিক্শা রেডি ছিল। রহমতুল্লা চালায়। বড়মামা কলে বেরিয়ে গেলেন। বাগানে আমি একা। লাকিটা তখন শুঁকে শুঁকে আমাকে টেস্ট করছে, আমার স্বভাব কি রকম। শুনেছি কুকুরটা নাকি শুঁকেই বলে দিতে পারে মানুষটা চোর না সাধু।

মেজমামার আবার কুকুর দু চক্ষের বিষ। নিজের ফুল বাগান থেকে হেঁকে বললেন, 'এদিকে আয়। একলা আসবি, ওই শয়তানটাকে আনবি না।' 'কুকুর যদি সঙ্গে সঙ্গে আসে আমার কি দোষ!' মেজমামা এক দাবড়ানি দিলেন, তোকেও এবার কুকুরে পেয়েছে! 'আমি কি করবো? পেছনে পেছনে আসছে যে!' 'ঠিক আছে তুই ওইখান থেকেই শোন তুই কার দলে?'

কি উত্তর দেব, বললুম, 'নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রও বলতে পারেন।'

'নিরপেক্ষ তো বড়র পেছনে ঘুরছিস কেন?' একটু ভেবে বললুম, 'ঘোরাচ্ছেন তাই ঘুরছি।' মেজমামা বললেন, 'ঘুরবি না, চুপ করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে।' এমন জানলে কে আসতো মামার বাড়িতে! দরকার নেই বাবা, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন দলে যাই। মাসীর কাছে যে ভিড়বো, তারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্র সংগীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাঝে মাঝে সময় পেলেই খরগোসে লাথি। লাথি মারার মত খরগোসের অভাব বড়মামা রাখেননি।

সকালের খাওয়া যেমন গুরুপাক হল, রাতের খাওয়াও কিছু কমতি হল না। দুপুরের আবার গোটা ডাবের জল! সব মিলিয়ে টইটম্বুর ভরা নদীর মত অবস্থা। রাতের খাবার পর একটা বিশাল দাঁড়ানো টেবল ল্যামপ জ্বেলে মেজমামা মোটা একটা দর্শনের বইয়ে ডুবে গেলেন। সংসারে তখন কে কার। দুবার পাশে ঘুর ঘুর করলুম, মনে হল মেজমামা যেন চেনেনই না। দিশি কাপড়ের কোঁচার খুঁট কারপেটে লুটোচ্ছে। বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটা সোফার তলায় শরীর ঢুকিয়ে কোঁচার খুঁট চিবোচ্ছে। মেজমামাকে বললুম। গ্রাহ্যই করলেন

না। শেষে বললেন, যা বললেন তার মানেও বুঝলুম না, সংসারে কিছুই চিরকাল থাকে না। শরীরটাই যখন চলে যাবে তখন তুচ্ছ কোঁচার খুঁট। আবার সকালেই চায়ের টেবিলে মেজমামার অন্য রূপ দেখবো। কাঁধে ঝাড়ন। এটা ঝাড়ছেন ওটা ঝাড়ছেন। তখন এই চিবোনো কাপড় নিয়ে বড়মামার সঙ্গে ধুম লেগে যাবে। মাসীকে হুকুম হবে অজই খরগোসের রোস্ট বানা।

রাত ১১টা নাগাদ বড়মামা বললেন, 'চল এবার শোয়া যাক। আমি একটা সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঘুম চোখেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিন তলায় উঠে এলুম। পিছন পিছন লাকি। বড়মামার হাতে পাঁচ শেলের একটা টর্চ। বড়মামার ঘরটা বেশ বড়ই। বিশাল একটা খাট, খাটের তলায় ডাবের গোডাউন। চারি দিকে বড় বড় জানালা। দুটো জানালা ছাদের দিকে। সারা ছাদ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। পিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলেন। 'বন্ধ করছেন ?'

'তোর তো আবার সর্দির ধাত।' বড়মামার উত্তরে অবাক হয়ে গেলুম, 'কে বললে আমার সর্দির ধাত।' বড়মামা বললেন, 'আমি জানি। জানিস, আমি ডাক্তার।' 'তা জানি কিন্তু আমার সর্দিকাশি বহু বছর হয়নি।' আমি একটু প্রতিবাদ করে ফেললুম। বড়মামা বললেন, 'দেখি তোর নখ।' অবাক হয়ে হাতের দশটা আঙ্গুল টর্চের আলোর তলায় মেলে ধরলুম। 'এই দেখ', বড়মামা দেখালেন, দেখছিস নখের উপর সাদা ফুল। ক্যালসিয়ামের অভাব। সর্দি তোর হবেই, হতে বাধ্য। দাঁড়া, আমার গরুর দুধ হোক। দুধখাইয়ে তোর সর্দি সারিয়ে দেবো।'

বিছানার উপর কেমন চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ছিল। জানালা বন্ধ করে বড়মামা চাঁদের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। 'কেমন চাঁদের আলো আসছিল সমুদ্রের জলের মত', আমি খুঁতখুঁত করে উঠলুম। 'চাঁদের আলো!' বড়মামা চমকে উঠলেন, চাঁদের আলো গায়ে লাগলে কি হয় জানিস!' কি হয় কে জানে! বড়মামার ব্যাখ্যা,

'চাঁদের আলো বেশি গায়ে লাগলে চর্মরোগ হয়।' তর্ক না করে শুয়ে পড়লুম। পাতলা মশারি নেমে এল। দুটো বালিশের মাঝখানে টর্চলাইট। লাকি চলে গেল ঘরের কোণে তার নিজের জায়গায়।

বড়মামার হাই উঠলো। 'ঘুমোলি নাকি?' 'না'। ভূতের ভয় আছে!' গা-টা একটু ছম ছম করে উঠলো। 'ভয় নেই আমি আছি, টর্চ আছে।' 'ভূত আছে নাকি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম। 'থাকতে পারে, তাই তো ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলুম!' বড়মামার আর একটা হাই উঠলো। 'আজ তুই পাশে আছিস, ভূত এলে দুজনে লড়বো। অন্য দিন একলা থাকি তো, একটু ভয় ভয় করে। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ আর খাইনি।'

বড়মামার কথায় ঘুম চমকে গেল। টর্চটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম। ভূত তাড়াবার দাওয়াই। আমার ঘুম আসার আগেই বড়মামার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। বেশ মিঠে ডাক। ফুড়ুত, ফুড়ুত, ফুড়্, ফুড়্, ফুড়ুত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নিজেই জানি না। হঠাৎ কোঁক করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুকের উপর দুম করে এটা কি পড়ল! ভয়ে ভয়ে হাত দিলুম। বড় বড় লোম। কি এটা! ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যাবার জোগাড়। শেষে আবিষ্কার করলুম বড়মামার হাত। হাতটাই দমাস করে বুকে পড়েছে। হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলুম। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম কি আর আসতে চায়! ছাদে যেন একটা খড় খড় আওয়াজ হল। ক'টা বাজল কে জানে! চোখ চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। বড়মামার হাতটা উপরে উঠলো, এইবার পড়ছে, পড়ছে, উরে বাবা, আমার বুকের দিকে নেমে আসছে, তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে খাটের সীমানায় সরে গেলুম! হাতটা দুম করে পাশে পড়ল। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলুম। এরপরই দুম্ করে বড়মামা একটা পা ছুঁড়লেন। নেহাৎ সীমানার বাইরে ছিলুম। তা না হলে ফুটবল হয়ে যেতুম!

আড়ষ্ট হয়ে, সেই খাটের সীমানায়, বড়মামার হাত আর পায়ের ধাক্কা থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে আবার কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোনো

এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপর শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে ছুরির ফলার মত কি যেন ঘাড়ের কাছের নরম জায়গায় খোঁচা মারছে। ঘুম ভেঙে গেল! এ কি! আমি কোথায় শুয়ে আছি! মাথা উঁচু করতে গেলুম। উঃ! মাথা ঠুকে গেল। ঘরের ছাদটা মাথার এত কাছে নেমে এল কি করে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। আমি পড়ে আছি খাটের তলায়। ডাবের গাদার উপর। নারকেল পাতার খোঁচা লাগছে ঘাড়ের কাছে। বড়মামার বিশাল একটা পা মশারি ভেদ করে খাটের পাশে ঝুলছে। মানে বেশ মোক্ষম লাথিই আমাকে খাট থেকে ডাবের গাদায় ফেলে দিয়েছে।

খাটে ওঠার আর চেষ্টা করলুম না। বড় বিপজ্জনক জায়গা। বড়মামার দুটো হাত আর পা'র মহড়া নেবার মত শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে কেরালার ডাবের উপর শুয়ে থাকাই ভাল। একটু অসমতল। তা আর কি করা যাবে! ভোর হতে আর কতই বা দেরী। বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার। মাথার উপর খাটের ছাদে বড়মামা সারা রাত অবশ্য শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন! আমি তখন ছাদে হাওয়া খাচ্ছি।

হাড়ের নস্যির ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিতে নিতে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘুমোলি বল, ফাসক্লাশ।' লাকি বেঁড়ে লেজটা দুবার নাচিয়ে দিল।

———

বড়মামা সাইকেলের বল বেয়ারিং-এ তেল দিচ্ছিলেন। মেজো-মামা রকে জলচৌকির উপর আয়না রেখে ছোট মত একটা কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন। আমি একটা বেতের মোড়ায় বসে বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোশটার অপকর্ম দেখছিলাম। সেটা একটা জুতো পরিষ্কার করার বুরুশ কুড় কুড় করে খাচ্ছিল। ভেবেছিলাম সরিয়ে নেবো। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হবে না। এ বাড়ির পশুদের স্বাধীনতায় বাধা দেবার মত ডিকটেটার যখন কেউ নেই, আমি তো একটা নেহাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।

তেল দেওয়া শেষ। বড়মামা চাকা দুটোকে বাঁই বাঁই করে বারকতক ঘুরিয়ে সাইকেলটাকে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রাখলেন। তেল চেবার কেলে ডিবাটাকে পাঁচিলের ফোকরে রাখতে রাখতে বললেন —'সাইকেল চাপবে সব ব্যাটা, তেল দিয়ে মরবে সুধাংশু ব্যাটা। কেন? কেন শুনি!' বুঝলাম কথাটা বলা হচ্ছে মেজমামাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। মেজমামার হাতের কাঁচির কুট্‌কুট্‌ শব্দ থেমে গেছে। কান দুটো খাড়া খাড়া। কাঁচিটা চৌকির উপর রেখে বললেন—'তেল ছাড়াই সাইকেল চলে। তেল দেওয়া যাদের অভ্যাস তারা কিছু না পেলে সাত সকালে সাইকেলেই তেল দেবে। মানুষের নেচার তো আর পাল্টানো যাবে না।'

কিছুদূরে কলতলায় বড়মামা হাতে সাবান ঘষতে ঘষতে কথাটা শুনলেন। শুনে সাবান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'গোঁফ ছাঁটচিস ছাট। সুধাংশুর মুকুজ্জের চরকায় তেল দিতে আসিসনি সুধাংশু মুকুজ্জে কবে কাকে তেল দিয়েছে রে! আই অ্যাম এ সেলফ্ মেড ম্যান।'

মেজমামা কাঁচিটা হাতে তুলে নিলেন। ফুঁ দিয়ে কুঁচো ওড়াতে ওড়াতে বললেন—'মিথ্যে বল না। এইমাত্র সাইকেলে তেল দিচ্ছিলে। বরং বলতে পার আমি একটা লোক যে কাউকে তেল দেয় না, এমন কি সাইকেলেও নয়।'

মেজমামার কথার কেরামতির সামনে বড়মামা প্রায়ই একটু অপ্রতিভ মত হয়ে পড়েন। ঠিক পেরে ওঠেন না। আজও তাই হলো। সত্যই তো তেল দিচ্ছিলেন সাইকেলে। এই মাত্র, একটু আগে। নিজেই মেজোকে শুনিয়ে বলেছিলেন—'তেলের ব্যাপারটা তাঁরই।' বড়মামা কলের তলায় হাত পেতে চারদিকে ছেলেমানুষের মত খানিক জল ছিটোলেন, তারপর তারে-ঝোলা তোয়ালের এক কোণে হাত মুছতে মুছতে দেরিতে হলেও জবাবটা যেন খুঁজে পেলেন: 'তুইও একটি জায়গায় তেল দিস এবং ভাল করেই দিস।'

মেজমামার হাতের কাঁচি আবার থেমে গেল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেমে বললেন—

'আমি! আই নেভার টাচ অয়েল।'

'হ্যাঁ, তুমি।' বড়মামা গলাটা একটু বিকৃত করে বললেন, 'তুমি রোজ সকালে চানের আগে তোমার নাইকুণ্ডুলে আধবাটি তেল ঢাল। সকলে জানে। জিজ্ঞেস করে দেখ তুমি সকলকে!'

'সে তো নিজের শরীরে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। এ তেল কি সে তেল নাকি। অয়েলিং মাই ওন মেশিন।'—'ওই হল রে। নিজেকে নিজে যারা তেল দেয় তারা ভয়ঙ্কর লোক। ভয়াল, ভয়ঙ্কর অজগর সর্প'। বড়মামা মুখটাকে হাঁ মত করে হাত-পা নেড়ে মেজমামার ভয়ঙ্কর চরিত্রটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার বড়মামার নজর পড়ল আমার দিকে। মোড়ার ওপর পা

গুটিয়ে বসে বসে মজা দেখছিলুম। খরগোসটা জুতো ঝাড়া বুরুশটাকে টানতে টানতে প্রায় পায়ের কাছে এনে তিনের চার অংশই মেরে দিয়েছে। গোঁফের সঙ্গে বুরুশের চুল জড়িয়ে আছে।

'তাই এখানে বসে বসে চোরের মত কি করছিস? তোকে আমি সেই সকাল থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি।'

'আমি তো সারা সকাল এখানেই বসে আছি। দেখতে পাননি।'

'দেখার কি উপায় আছে। অতবড় একটা পর্বতের আড়ালে বসে আছিস। তিন ঘণ্টা ধরে শুধু গোঁফই ছেঁটে যাচ্ছে। গোঁফের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

মেজমামা হাঁটু খুলে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে একটু টাল খেয়ে পড়ে যাবার মত হলেন। অনেকক্ষণ পা মুড়ে বসে থাকার জন্যেই বোধ হয়। সেই টাল খাওয়া অবস্থাতেই মেজমামা বললেন, 'তুমি গোঁফের মর্ম কি বুঝবে বল? তোমার তো সব চাঁছা ছোলা—প্লেন। পুরুষের মত পুরুষ যারা তাদের সব ইয়া ইয়া গোঁফ। গোবর, গামা, বড়ে গোলাম আলি, আখতার সিং, স্বর্ণ সিং। তুমি সুধাংশু মুকুজ্জে, তোমার না আছে গোঁফ, আর না আছে দাড়ি।' মেজমামা বেকায়দা অবস্থা থেকে কথা বলতে বলতে সটান উঠে দাঁড়ালেন, এক হাতে আয়না অন্য হাতে কাঁচি। এতক্ষণ আমার উপর নজর পড়েনি, এইবার পড়ল।

'তুইও আমার মত গোঁফ রাখবি। গোঁফ না রাখলে পুরুষ মানুষকে মেনি বেড়ালের মতো দেখায়।'

বড়মামা জুতো পরছিলেন। এক পায়ে জুতো, অন্য পা রকের কোনায় ঘষে ঘষে ধুলো ঝাড়ছিলেন। মেজমামার মন্তব্যে উত্তর না দিয়ে পারলেন না, 'ডাক্তারদের তোর মত গুঁপো হলে চলে না বুজেছিস। আমার মুখ দেখে রোগীদের আদ্দেক অসুখ সেরে যায়। আমার মুখখানা দেখেছিস! অনেকটা যিশুর মত। এ মুখ দেখলে মানুষ ভরসা পায়, তোর মুখ দেখলে ভিরমি যায়।'

মেজমামা একটা প্রাণ খোলা হাসি হাসলেন, তারপর একখানা

সংস্কৃত ছাড়লেন—'অমৃতং বাল ভাষিতং।' দুম্ দুম্ করে এগিয়ে গেলেন কলের দিকে, যাবার সময় একহাত দিয়ে তার থেকে তোয়ালেটা টেনে নিলেন! গোটা কয়েক হ্যাণ্ডার ঝুলছিল। পাকা আমের মত টপাটপ পড়ে গেল। বড়মামার কুকুর লাকি এক পাশে মৌজ করে শুয়েছিল। একটা পড়ল তার ঘাড়ে। সে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। খরগোসটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল।

জুতো পরা শেষ। বড়মামা বললেন—'চল।' তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলুম। 'কোথায় যাবেন?'

'চল চল। কলে যাবো। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবি তো?'

'কেন পারবো না!'

মেজমামা মুখে জল থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, 'কেন ছেলেটাকে খানায় ফেলবে। তোমার তো ব্যালেন্স নেই। বেশ বসে আছে চুপচাপ। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন—'যাবি না তুই?'

মহা বিপদে পড়লাম। কার কথা শুনি। আমি কিছু বলার আগেই মেজমামা বললেন, 'না না, তোমার সঙ্গে ও কোথায় যাবে? ওর জীবনের দাম আছে।'

বড়মামা গম্ভীর গলায় বললেন—'উত্তরটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনতে চাই। নট ফ্রম এনি থার্ড পার্সন।' বড়মামা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আশু ময়রার বাড়িতে কল আছে। এই বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবে। একলা আর কত খাবো। তুই তবু কাছে থাকলে খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প্ করতে পারবি। চল উঠে পড়! রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

মোল্লার চকে আশু ময়রার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। লোভ সামলানো খুব মুশকিল। উঠে পড়তে হল। মেজমামা বললেন, 'ডাক্তার আমি অনেক দেখেছি, তবে পেটুক ডাক্তার বড় একটা দেখা যায় না।

সেদিক থেকে তুমি অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু। ডাক্তার না হয়ে বামুন হওয়াই উচিত ছিল।'

'ডিসপেপসিয়ায় সারা জীবন ভুগলে সুস্থ মানুষকে পেটুক বলেই মনে হবে। তোর দোষ নেই রে, তোর ভাগ্যের দোষ। সারা জীবন ঘুমিয়ে কাটালি। একটু ব্যায়াম করলি না। বদ হজমে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আর পাগলে? পাগলে কি না বলে। বাকিটা তুই বল?' বড়মামা আমার ডান কানটা একটু মুচড়ে দিলেন।

'ছাগলে কি না খায়' বলে পাদ পুরণের সাহস হল না। মেজ-মামাকে ছাগল বলাটা খুব গর্হিত কাজ এই বুদ্ধিটা অন্তত আমার আছে। বড়মামা ইতিমধ্যে সাইকেলটাকে হাঁটাতে হাঁটাতে বাড়ির বাইরে বাগানে গিয়ে পড়েছেন। সামনের রডে ক্লাম্প দিয়ে আটকানো কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগ। গলার দুপাশে বুকের উপর ঝুলছে বুক-দেখা যন্ত্র। লম্বা চওড়া ফরসা চেহারা। মুখে সব সময় একটা হাসি লেগেই আছে।

বড়মামা পকেট থেকে কাগজে মোড়া দুটো পিপারমিণ্ট লজেন্স্ বের করলেন। একটা আমাকে দিলেন। মোড়ক খুলে অন্যটা নিজের মুখে ফেলে দিলেন, 'বুঝলি, সব সময় নিজেকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত রাখবি। একদম আইড্ল্ থাকবি না। যখন কোনো কাজ নেই তখন লজেন্স খাবি। নে উঠে বস। দুপাশে পা ঝুলিয়ে দে আর কেরিয়ারের সামনের সিটের পিছনের এই প্যাঁচানো লোহার গোলটা শক্ত করে ব্যালেন্স রেখে বস। ছটফট করবি না। বারে বারে ঘাড় ঘোড়াবি না।'

বড়মামার সাইকেল চলল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। ঝাঁকুনিতে হ্যাণ্ডেলের বেলটা টিন টিন শব্দ করছে। মাঝে মাঝে সাইকেলটা লগবগ করে উঠছে। বড়মামা বলেছেন, 'ভয় পাবি না একদম।' দূরে রাস্তা জুড়ে একটা গরুর গাড়ি আসছে। দুপাশে বিশাল নর্দমা। আমি একটু মিনমিনে গলায় বললুম, 'বড়মামা নর্দমা।' বড়মামা বললেন, 'স্টেডি থাক, দেখ-না নর্দমার পাশ দিয়ে কায়দা করে সুট্ করে বেরিয়ে যাবো। তুই বরং চোখ বুজে থাক।'

চোখ বুজিয়েই মেজমামার কথা মনে পড়ে গেল—'কেন ছেলেটাকে মারবে।' বড়মামা বললেন, 'পা দুটোকে ছড়াসনি, গরুর গাড়ির চাকায় ঘষে যাবে, ক্লোজ করে রাখ!' পাশ দিয়ে হাওয়ার মতো কি একটা বেরিয়ে গেল। চোখ খুললাম। গরুর গাড়ি পেরিয়ে এসেছে। ফাঁকা রাস্তা সটান বেরিয়ে গেছে। বড়মামা সাইকেলে স্পিড দিলেন। বললেন, 'দেখলি তো, একে বলে সাইকেল চালানো। আমিও চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। আমার ঠাকুমা শিখিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনি চোখ বুজিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ রে! তা না হলে তো খানায় পড়ে যেতুম। ঠাকুমার শিক্ষা আজো ভুলিনি।'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সাইকেলের পিছনে বসে রইলুম। ঠাকুমা কি মারাত্মক শিক্ষা বড়মামাকে দিয়েছিলেন। বড়মামা এখন গুন গুন করে গান গাইছেন, 'কি রে ঘুমোলি নাকি?'

'সাইকেলে বসে কেউ ঘুমোয় নাকি?'

বড়মামা হাসলেন, আমি তখন তোর মত ছোটো। বাবার সাইকেলের পেছনে বসে তুই যেমন চলেছিস, আমিও চলেছি বাবার সঙ্গে কলে। সময়টা কেবল তফাৎ। সকাল নয় রাত্রি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হাত আলগা হয়ে ধপাস! ওদিকে বাবাও চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। টের পাননি আমি পড়ে গেছি। বাবার আবার ভীষণ ভুলো মন। রুগীর বাড়ি গিয়ে খেয়ালই হয়নি যে আমি সঙ্গে ছিলুম। রুগীটুগি দেখে ঘুর পথে বাবা বাড়ি এলে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন—'ন্যাড়াকে কোথায় রেখে এলে?' বাবা তখন খেতে বসতে যাচ্ছেন। লাফিয়ে উঠলেন—'তাই তো?'

ঝগড়া করতে করতে দুটো কুকুর সাইকেলের সামনে চলে এসেছে। বড়মামা কায়দা করে কাটাতে গেলেন। ভীতু কুকুরটা পালাল। মোটা কেলে কুকুরটা সামনের চাকায় এসে পড়ল। তারপর কি হ'ল বোঝা গেল না, কুকুরটার একটা পা জড়িয়ে গেল স্পোকের সঙ্গে। বড়মামা,

আমি এবং কুকুর তিন জনেই ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারের ঘাসের উপর পড়ে গেলুম। সাইকেলটা ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন—'আমার দোষ নেই। দেখলি তো কেলে ব্যাটা চাকায় জড়িয়ে গেছে। তুই বলতে পারবি না যে আমি ফেলে দিয়েছি।' বড়মামা প্রথমে উঠলেন ধুলোটুলো ঝেড়ে। আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। সাইকেলের চাকায় পা জড়ানো অবস্থায় কুকুরটা তখন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে চলেছে।

রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে বড়মামা কুকুরটার অবস্থা ভাল করে দেখলেন। আমি বড়মামার চেয়ে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ডান পা'টা চাকার স্পোকে পাকিয়ে গেছে, 'বড়মামা?'

'বল?'

'দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ তো ছাড়ানো যাবে না! ছাড়াতে গেলেই কামড়ে দেবে।'

'হুঁ, বলেছিস ঠিক। এ রকম ঘটনা আগে কখনো দেখেছিস?'

'না বড়মামা। এ জিনিস দেখা যায় না। পা'টা বোধ হয় অ্যামপুট করতে হবে।'

বড়মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, 'কি যে বলিস? ডাক্তার হয়েছি কি করতে? দেখেছিস কুকুরটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে?'

'তুমি ওর চিৎকারটা বন্ধ করতে পার?'

বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে আবার দুটো লজেন্স বেরোলো। একটা আমার। একটা বড়মামার। লজেন্সটা চুষতে চুষতে বড়মামা বললেন—'আমার কেরামতিটা একবার দেখ'

'হাত দেবেন নাকি?'

'দেবো, তবে একটু পরে!'

'সাইকেল থেকে ডাক্তারি ব্যাগটা খুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে বেরোলো ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ, ওষুধের অ্যাম্পুল। শুনেছি, কুকুরে কামড়ালে পেটে ইঞ্জেকসান নিতে হয়। ভাবলুম, বড়মামা বোধ হয় আগেই নিজের পেটে ছুঁচ ঢুকিয়ে তারপর কুকুরটাকে ধরবেন। কারণ

ধরামাত্রই কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে দেবে।

না। বড়মামা করলেন কি, কুকুরটার পাছায় পুট্ করে ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন।

'কি লাগালুম বল তো? মরফিয়া, কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়বে দেখবি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটা লটকে পড়ল। বড়মামা আস্তে আস্তে পাটা বের করে আনলেন। শোচনীয় অবস্থা। পাটা পেঁচিয়ে গেছে।

'একটা গাছের ডাল ভেঙে আনতে পারিস?'

দূরে একটা বেড়ার ধারে জিওল গাছ হয়েছিল। একটা ডাল তৎক্ষণাৎ ভেঙে নিয়ে এলুম। বড়মামার ব্যাগ থেকে চওড়া ব্যাণ্ডেজ বেরোলো। ডাল দিয়ে টাইট করে কুকুরটার পা ব্যাণ্ডেজ করা হল।

'নে, ধর।'

চ্যাংদোলা করে একটা ঝোপের ধারে কুকুরটাকে শুইয়ে দেওয়া হল। কখন জ্ঞান হবে কে জানে। বড়মামা বললেন—'চড়া ডোজ দিয়েছি। বিকেলের আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গিয়েছিল। সামনের চাকার উপর ঘোড়ার মত বসে দু'হাত দিয়ে বড়মামা হ্যাণ্ডেলটা ঠিকঠাক করলেন। সাদা প্যাণ্টে খাবলা খাবলা ধুলো। বড়মামাকে তখন ডাক্তার নয়, মিস্ত্রীর মত দেখাচ্ছিল।

'বিকেলে আবার কুকুরটাকে দেখে যেতে হবে। জায়গাটা মনে রাখিস! কালভর্টের ধারে ভাঁট ফুলের ঝোপ।'

সাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন—'ইস্, ভীষণ দেরি হয়ে গেল রে, আমার রুগী বোধ হয় এতক্ষণে টেঁসে গেল।'

বড়মামার সাইকেল এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হুড়মুড় করে চলল। আমি ভয়ে সিঁটকে বসে রইলুম। একবার আছাড় খেয়েছি আর একবার খেতে কতক্ষণ! হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে, বেশ জ্বালা করছে। ঘাড়টা মটকে গিয়ে ভীষণ ব্যথা করছে।

'তোর কোথাও লেগেছে নাকি রে।'

হাসি হাসি গলা করে বললুম—'না বড়মামা। খুব একটা লাগেনি।

'লাগবে কি করে বল, আমরা তো আস্তে আস্তে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লুম, তাই না ? মেজোকে কিন্তু একটা কথাও বলবি না। বললে হৈ হৈ করে বাড়ি মাথায় করবে।'

একটা লাল রকওলা বড় বাড়ির সামনে বড়মামা সাইকেল থেকে নামলেন। মার্বেল পাথরের ফলকে লেখা, 'পঞ্চী লজ'। রকের পাশে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে আমের আঁটি চুষছিল। বড়-মামাকে দেখে, 'ডেক্তার এসেছে, ডেক্তার এসেছে'—বলে বাড়ির ভেতর দৌড়োল। বড়মামা সাইকেলটা ঢোকাচ্ছেন, বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, মিশকালো বিশাল মোটা এক ভদ্রলোক। বেঁটে, মাথায় চুল কাঁচাপাকা, পালোয়ানের মত ছাঁটা। পাকা পুরুষ্ট দু'জোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপর কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত বসে আছে। পরনে লাল গামছা, গায়ে একটা হলদেটে রঙের ফতুয়া। ভুঁড়িটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। খালি পা।

'এস এস, ডাক্তার এস', গরিলার থাবার মত দু'টো হাত তুলে বড়মামাকে সাইকেল সুদ্ধ প্রায় জড়িয়ে ধরেন আর কি! বড়মামা কোনো রকমে রক্ষা পেলেও আমি পেলুম-না।

'খোকাটি কে?' যেই বড়মামা বললেন, 'ভাগ্নে' ভদ্রলোক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জমি থেকে ফুটখানেক উপরে তুলে দুম করে ছেড়ে দিলেন। 'কোনো ওজন নেই ডাক্তারবাবু। একেবারে দুবলা। খায় টায় না নাকি।'

সাইকেলটা উঠোনের কোণে দাঁড় করাতে করাতে বড়মামা বললেন, 'আর বলবেন না, আমাদের বংশের কলঙ্ক। খাচ্ছে দাচ্ছে, কোথায় যে সব যাচ্ছে। গায়ে কিছুই লাগছে না। ব্যাটার পেটে বোধ হয় ক্রিমির বংশ আছে। দাঁড়ান না, আমার পাল্লায় পড়েছে, ক্রিমির বংশ ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

'ক্রিমি!' আশুবাবু শব্দটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন তাঁর পায়ের কাছেই গোটা কতক ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'রোজ সকালে এক গেলাস করে নিমপাতার রস খাওয়ান না। আমার ছোট নাতিটার হয়েছিল।

সারাদিন খাই খাই করত, এখন রোজ দশটার বেশি সন্দেশ খায় না।'

আশুবাবুর সারা গায়ে একটা টকটকে ছানার জ্বালর গন্ধ। ছানার জিনিস সুস্বাদু, কিন্তু গন্ধ সহ্য করা শক্ত।

'কার অসুখ ডাক্তারবাবু!' এবার ডাক্তারের মত গম্ভীর গলা বড়-মামার!

আশুবাবু হাত কচলে অপরাধীর মত গলায় বললেন, 'আমার অসুখ।'

চলমান পাহাড়ের মত আশুবাবুর গামছা আর ফতুয়া পরা শরীরের দিকে বড়মামা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। আশুবাবু বড়মামার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন, ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করছেন না।

উঠোনের চারিদিকে চওড়া লাল রক, চকচকে তেলা। একদিকে গোটাকতক দামী পুরু সোফা। আশুবাবু বড়মামা আর আমাকে নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন। বসতে বসতে বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে কি?'

'মেয়েরা বলছে ভূতে ধরেছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে অন্য রকম। ওরা সব রোজাও এনেছিল। ওই ব্যাটা দক্ষিণ পাড়ার পরশুরাম। অনেক টাকার ধার খেয়ে রেখেছে আমার দোকান থেকে। সেই ঝালটাই আমার উপর রোজা সেজে ঝাড়ল। কি ঝাঁটাই যে পিটেছে আমার পিঠে, এই দেখ ডাক্তার।' আশুবাবু ছলছলে চোখে পিঠ খুলে বড়-মামাকে দেখালেন। কালো কুচকুচে চওড়া পিঠে দাগড়া ঝ্যাটার দাগ।

'ঝ্যাটাটা নতুন ছিল না পুরানো?' বড়মামার অন্য ধরনের প্রশ্ন।

'পুরোনো ঝ্যাটা ডাক্তার। একেবারে মুড়ো খ্যাংরা। আমার নিজের পরিবার উঠোনের কোণ থেকে নিজে হাতে করে সেই শয়তানটার হাতে তুলে দিলে। এও এক প্রতিশোধ।'

পিছনে দরজার পাশে চুড়ির শব্দ হল প্রথমে, তার পর শোনা গেল একখানা গলার মত গলা। মনে হল, আট রকমের বাদ্য যন্ত্র একসঙ্গে আট রকমের সুরে বাজছে, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। প্রতিশোধের কি? আত্মার ভর করল, ভালর জন্যে রোজা ধরে আনলুম।

কথা দেখ! বলে যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।'

'শোনো ডাক্তার, তুমিই এর বিচার কর।'

আশুবাবু চোখের জল মুছে তেড়ে মেড়ে উঠলেন, 'তুমি তিথি করতে যাবার জন্যে টাকা চেয়েছিলে—হ্যাঁ কি না।' সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেল।

বড়মামা বিচারকের আসনে।

উত্তর এল দরজার পাশ থেকে— হ্যাঁ।'

'আমি কি বলেছিলুম?'

'হাতে টেকা নেই, তিথি এখন মাথায় থাক। গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে জল ঢাল। তারপর গুন গুন গ্যান গেয়েছিলে গয়া গঙ্গা পেভাসাদি ক্যাশী কাঞ্চি কেবা চায়।'

'তুমি কি বলেছিলে?'

'কিপটে বুড়ো, মলে ট্যাকা কি সঙ্গে যাবে?'

'আর কি বলেছিলে?'

'আর কিছু বলিনি।'

বল নি? মিথ্যেবাদী। এই নারায়ণের মাথায় হাত রেখে বল তো, আর কিছু বলিনি।' আশুবাবু সোফা থেকে আমাকে খামচে তুলে ধরে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন। অন্য সময় হলে রেগে যেতুম, যেহেতু নারায়ণ বলেছেন তাই রাগলুম না।

দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বলেছিলুম চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।'

'আমি চোর!'—আশুবাবু সপ্তমে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা চোখ বুজিয়ে ছিলেন। আচমকা চিৎকারে চমকে উঠলেন। হাত থেকে বুক-দেখা যন্ত্র ছিটকে পড়ল। বড়মামা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে বললেন— 'বাস্ বাস্, নো মোর।'

বিচারকের গলায় ইংরেজী শুনে আশুবাবু শান্ত হলেন। আমি দারগার কাছে ভোঁদার মত দাঁড়িয়ে ছিলুম। বড়মামা ডাকলেন, 'চলে আয়।' বড়মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারী ব্যাগ খুললেন। বেরোলো

অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে একটা কৌটো। আশুবাবু আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পান নাকি ডাক্তার, জর্দা দেওয়া ?'

বড়মামা খুব রেগে আছেন মনে হল, কোন উত্তর নেই।

কৌটো হাতে আবার সোফার উপর চেপে বসলেন। পান খাবার লোভে আশুবাবুর চোখ চকচক করছে।

'একটা দেবে নাকি ডাক্তার ?'

কৌটো খুলতে খুলতে বড়মামা বললেন, 'দেবার জন্যেই তো এসেছি।'

কৌটো থেকে পান বেরোলো না, বেরোলো ইঞ্জেক্সানের সিরিঞ্জ। আশুবাবু যে এত ভাল দৌড়তে পারেন জানা ছিল না। নিমেষে একটা কালো তাল উঠোনের ও মাথায় বাথরুমের দিকে গড়িয়ে গেল! দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। বড়মামা সিরিঞ্জের পেছনে ধীরে ধীরে পিস্টনটা পরালেন। মুখে একটা লম্বা ছুঁচ ফিট করে উঠে দাঁড়ালেন। বড়মামার চোখ দেখে মনে হল যেন বাঘ শিকারে যাচ্ছেন। দরজার দিকে মুখ করে বেশ ভারী গলায় আশুবাবুর পরিবারের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কথাটা শোনো আছে নিশ্চয়—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। ইঞ্জেকশানটা তাহলে আপনাকেই নিতে হচ্ছে। কত্তা তো ভয়ে বাথরুমে পালালেন।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই দুটো মোটা হাত দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের গতিতে ছিটকিনি খুলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'নাউ হোয়াট টু ড় ? সহজে ছাড়ছি না। ডাক্তার ডেকে ইয়ার্কি! এক ইঞ্জেক্সানে ভূত ছাড়িয়ে দোবো।' বড়মাম বন্ধ বাথরুমের দরজার কাছে সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে গেলেন। আশুবাবু বাথরুমে বন্ধ। দরজায় একটা টোকা মেরে বড়মামা বললেন, 'কতক্ষণ বসে থাকবেন ? আমিও রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে, ইঞ্জেক্সান আপনাকে নিতেই হবে।'

'আমার কিছু হয়নি ডাক্তার। মিছিমিছি বলেছিলুম।'

'কি বলেছিলেন শুনি ?'

'ওই পরিবারকে জব্দ করার জন্যে। একমাস কথা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন? তাই তো বলেছিলুম।'

'কি এমন বলেছিলেন যে রোজা ডাকতে হল ভূত ছাড়াবার জন্যে?'

'বলেছিলুম, রোজ রাতে ঘর অন্ধকার করে শুলেই কে যেন কানের কাছে বলছে, আশু, আর কেন তোর দিন তো শেষ হয়ে এল রে! আর বলেছিলুম কানের কাছে অষ্টপ্রহর কে যেন কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সব মিছে কথা ডাক্তার। ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিলুম।'

'সব বুজেছি, এখন দয়া করে বেরিয়ে আসুন, পিঠের যা অবস্থা, পাঁচলাখ পেনিসিলিন ঠুকে না দিলে বিষিয়ে মারা যাবেন!'

'ইঞ্জেকসান আমি নেবো না ডাক্তার, তোমার পায়ে পড়ি। ইঞ্জেকসানে আমার ভীষণ ভয়। আমার বাবা ওইতেই মারা গিয়েছিলেন।'

'তা বললে তো চলবে না। দেখেছি যখন আমায় ডাক্তারের কর্তব্য করতেই হবে।'

'তোমাকে আমি ডবল ফী দোবো ডাক্তার। একমাস বিনা পয়সায় বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবো, যত পার।'

'ঘুষ আমি খাই না আশুদা।'

আশুবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, 'দয়া কর ডাক্তার। তোমার আর কি? তুমি আছ ফাঁকা হাওয়ায়, আমি এদিকে গরমে, গন্ধে মারা যেতে বসেছি।'

'সেইজন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। বেরোনো মাত্রই ফ্যাঁস।'

আশুবাবু আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বড়মামা আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। বাথরুমের ভেতর ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল।

'কি হল বল তো!'

'বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।'

'হার্ট ফেল করেনি তো।'

'দেখতে তো পাচ্ছি না বড়মামা, তবে ভয়ে অনেকে হার্টফেল করে।'

'সে কি রে? পুলিশ কেস হয়ে যাবে যে! চল্ পালাই।' বড়মামা ছুটে সাইকেলের কাছে গেলেন। আমিও ছুটলুম পেছনে পেছনে।

বড়মামার সাইকেল ছুটেছে হাওয়ার বেগে। ঝড় ঝড় ঝড় ছড় শব্দ করছে। ইটে পড়ে মাঝে মাঝে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছে। কোনো রকমে কেরিয়ারে ঝুলে আছি।

কিছু দূরে গিয়ে বললেন, 'কোথায় যাই বল তো! চল্ পালাই। একটু পরেই তো পুলিস আসবে। তারপর অ্যারেস্ট। ওরে বাবারে!' বাবারে বলা মাত্রই বড়মামা টাল সামলাতে না পেরে সাইকেল উল্টে পড়ে গেলেন। আমিও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লুম।

ধুলোর ওপর শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন—'চল থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি। তুই আমার সাক্ষী। উল্টোপাল্টা কিছু বলবি না। আমি যা বলব তাইতেই সায় দিয়ে যাবি। বেধড়ক মারলেও অন্য কিছু বলবি না।'

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল গলা ছেড়ে মেজমামা-আ বলে চিৎকার করি।

থানা অফিসার টেবিলে মোটা রুল-কাঠ ঠুকতে ঠুকতে বড়মামার বক্তব্য শুনলেন। কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে আগা-গোড়া নিজেই একবার বলে গেলেন—'আশু ময়রা বাথরুমে ঢুকেছে। বেশ, ঢুকলো। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ছুটে গেল কেন? ও বুঝেছি। ভীষণ বেগ এসেছিল। আসতেই পারে, আমারও আসে, সকলেরই আসে। ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনলেন? ভারী, ভারী।' ভারীর জায়গাটায় এসে অফিসার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তা দেখে আমরাও কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

হঠাৎ অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, 'বুঝেছি। বেগ যখন প্রবল তখন শব্দও তো ভারী হবে। দুই আর দুয়ে চার। সেই শব্দ শুনে ব্যাগ-ট্যাগ ফেলে আপনি দৌড়ে চলে এলেন থানায়। কেন এলেন?

বড়মামা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আশুবাবু ইজ ডেড।'

'ডেড?' অফিসার হো হো করে হেসে উঠলেন 'বাথরুমে আশু ডেড। বেশ ডেড। ধরে নিলুম ডেড। এতে আশুর অপরাধটা কোথায়? অ্যারেষ্ট করার মত অপরাধটা সে কি করেছে? আমি তো মশাই কিছুই বুঝছি না। এতে পুলিস আসে কোথা থেকে।

বড়মামা বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ কোনো তরফেই কোনো কথা নেই। শেষে অফিসার হাসি হাসি মুখে বললেন, 'পাবেন না, কিচ্ছু খুঁজে পাবেন না। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের কোথাও লেখা নেই—বাথরুমে ছুটে যাওয়া অপরাধ, কিম্বা, শব্দ করে মল ত্যাগ করা অপরাধ। ইনডিসেণ্ট বলতে পারেন। তাই বা বলি কি করে—নেচারস্ কল।' অফিসার উঠতে যাচ্ছিলেন, বড়মামা বললেন, 'আর একটু! আর একটা কথা।' অফিসার বসে পড়লেন, 'বলুন। তবে যা-ই বলুন, কোর্টে প্রমাণ করতে পারবেন না। আশুকে জব্দ করতে চান, অন্যভাবে করুন, বাথরুম থেকে কায়দা করে বের করে এনে রাস্তায় করান, পাঁচ আইনে ফেলে দেবো।'

বড়মামা বললেন, 'সে কথা নয়। ধরুন, কেউ এসে বলল, আশুবাবুকে আমি মেরে ফেলেছি। তা হলে?

অফিসার রুল নাড়া বন্ধ করলেন—'সে তো মশাই সাঙ্ঘাতিক কথা! না, দাঁড়ান, হঠাৎ লোকে এমন কথা বলবে কেন? আর বললেই বা আমি বিশ্বাস করব কেন? আমরা কি কান-পাতলা লোক?'

'না, ধরুন যদি বলে?'

'বললেই হল! আচ্ছা বেশ, বলল। তখন আমরা ইনভেসটিগেশানে যাব। দেখবো কি ভাবে মার্ডার করেছেন। পোস্ট-মর্টেমে পাঠাবো। ফরেনসিক্ রিপোর্ট আসবে। ফিঙ্গার প্রিণ্ট নেবো। সেই প্রিণ্টের সঙ্গে আপনার হাতের প্রিণ্ট মেলাবো। মার্ডারের জায়গায় দেখবো খুনী কিছু ফেলে গেছে কিনা! মার্ডার কি মশাই ছেলেখেলা নাকি! অনেক জল ঘোলা করে তবে খুন হয়। অত সোজা নয় মশাই। ও সব আপনার কম্ম নয়। ভুলে যান ওসব।' কথা শেষ করে অফিসার

একটা হাঁক ছাড়লেন, 'রাম খেলোয়ান!' দূর থেকে উত্তর এল, 'যাই হুজুর।'

'টিফিন কেরিয়ার লে আও, আমি ফ্রাঙ্কলি বলছি মশাই, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, খেতে বসব, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।

বড়মামা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন—'একটা কথা।'

'একটা একটা করে অনেক কথা সেই থেকে বলে গেলেন, আর একটাও কথা নয়।'

'না না, কথা নয়। একটা পারমিশান। আমরা এই থানার কাছে ঘুরে বেড়াতে পারি?,

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরুন না, যত খুশি ঘুরুন। কত চোর ছ্যাঁচোড় ঘুরছে, আপনারা তো সৎ নাগরিক।'

আমরা দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। কিছু দূরেই একটা বটতলা। বটতলায় এসে আমরা পাশাপাশি বসলুম। পাশে সাইকেলটাকে দাঁড় করানো রইল! বড়মামা আমার কানে কানে বললেন, 'কোনো আশা নেই রে। নির্ঘাত প্রমাণ হয়ে যাবে। আমার ব্যাগটা আশুর বাড়িতে ফেলে এসেছি।' আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমার চটি দুপাটি ফেলে এসেছি।

'বড়মামা, এখানে বসে থেকে কি হবে?'

'তুই বুঝছিস না। যে কোনো মুহূর্তে আশুর বাড়ির লোক থানায় এসে যেতে পারে। এলেই আমি অফিসারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবো। এতে সাজা অনেক কমে যাবে।' বটতলায় বসে বসে দেখছি, লোকজন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি বেরোচ্ছে ঢুকছে। সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। বড়মামার পকেটে লজেনসও আর নেই। সূর্য ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ল। বটের ডালে ডালে পাখিদের কিচির-মিচিরও থেমে গেল।

'বড়মামা, আর কতক্ষণ?'

'আর একটু দেখি রে। বলা যায় না। প্রথমে দরজা ভেঙে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তরপর ওই পিঠে ঝাঁটার দাগ! দেখাব

আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে। সাংঘাতিক ডাঁহাবাজ মেয়েছেলে। একটা দিন একটু কষ্ট কর না আমার জন্যে। আমি ওই গারদে ঢুকলেই তুই চলে যাবি। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে সাক্ষীর কাঠগোড়ায়, কোর্টে।'

থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। আমি বোধ হয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বড়মামা বোধহয় ঢুলতে ঢুলতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। পেটা ঘড়ির কানফাটানো শব্দ আর মেজমামার ডাক ও ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসলুম। প্রথমে ঘুম চোখে বুঝতেই পারছিলুম না কোথায় আছি! বড়মামা ভেবেছেন ভোর হয়েছে, শুয়ে শুয়েই চোখ না খুলে বললেন—'রেখে যা।'

'কি রেখে যাবো?'

'তুই চা নিয়ে এলি কেন? কষ্ট করে তোকে আবার কে আনতে বললে?'

'চা নয়, চা নয়, উঠে বোসো।' মেজ ধাক্কা মারলেন।

বড়মামা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'সারেণ্ডার।' মেজমামার কাছে সারেণ্ডার করায় মেজমামা খুব খুশী হলেন। আমি তো জানি ব্যাপারটা কি?

মেজমামা বললেন, 'সারেণ্ডার করে ভালই করলে; কিন্তু তোমার আক্কেলটা কি? বটতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ, এদিকে আমরা ভেবে মরি। আশু ময়রা সেই দুপুরবেলাই লোক দিয়ে তোমার ব্যাগ, ফী'র টাকা, এক চ্যাঙারি ইয়া বড় বড় সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। লোকটি বললে, ডাক্তারবাবুর বড় বাইরে পেয়েছে বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। তোর চটি দুপাটিও দিয়ে গেছে। কি হয়েছিল তোমাদের? থানায় ডায়েরী করতে এসেছিলুম, অফিসার বললেন, খুঁজে নিন কাছাকাছিই আছেন. বড়টির মাথাটা গেছে, ছোটোটাকে বোবা বলেই মনে হল।'

বড়মামা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আশু বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে মানে? বহাল তবিয়তে আছে। আসার সময় দেখে এলুম গরম গরম রসগোল্লা ছাঁকচে। বেশি না, গোটা আষ্টেক খেলাম।

বেশি মিষ্টি খাওয়া ভাল নয়। সকালে ওই সন্দেশ থেকে গোটা আষ্টেক খেয়ে ফেলেছি খাবো-না খাবো-না করে।'

বড়মামা করুণ চোখে তাকালেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে মেজো।'

'চল, বাড়ি চল, কিছু জোটে কিনা দেখি।'

বড়মামা জুতো খুলে রেখেছিলেন। দাঁড়াবার আগে পা গলাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার জুতো!' ঝুঁকে পড়ে আমরা সবাই দেখলুম, জুতো নেই, মিসিং। এর পরের লাফটা আরো বড়, 'আমার সাইকেল!' বটতলাটা গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করা হল, সাইকেলও নেই।

'বুঝেছি!' বড়মামা বললেন, আমরা না বুঝে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মেজমামা বললেন, 'কি বুঝলে?' উত্তর পাওয়া গেল না, বড়মামা হনহন করে থানায় গিয়ে ঢুকলেন। আমরা পেছনে পেছনে। অফিসার চেয়ারে একটা পা তুলে ভীষণ চিৎকার করে ফোনে কথা বলছিলেন—'দুটোর মাথা ঠুকে দে। পেটে গোটাকতক রুলের গোঁত্তা মার।' কথা আর শেষ হতেই চায় না। ফোন নামাতেই বড়মামা বললেন, 'আমার জুতো আর সাইকেলটা দিন স্যার, এইবার বাড়ি যাই!'

অফিসারের মুখের নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। জীবনে আমি কাউকে এমন অবাক হতে দেখিনি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তারপর বড়মামার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কালই ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। দয়া করে আমায় মুক্তি দিন। সকালে ছিল খুন, এখন জুতো আর সাইকেল। আমাদের সারাদিন বড্ড খাটতে হয়, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।'

বড়মামা অফিসারের বিনয়ে একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না ঠিক ইয়ারকি নয়, সাইকেল আর জুতোটা পাচ্ছি না। ঘুমোচ্ছিলুম তো, তাই ভাবলুম যদি তুলে রেখে থাকেন।'

'আমাদের কি পড়েছে মশাই ধরে ধরে লোকের জিনিস তুলে রাখবো? কাল সকালে এসে খুঁজে নেবেন। আজ অন্ধকার তো।'

বড়মামা বললেন, 'তাই হবে।'

থানার বাইরে এসে বড়মামা বললেন, 'জুতোটা না হয় বুঝলুম ছোটো জিনিস। কুকুরেও নিতে পারে। কিন্তু সাইকেল একটা বড় জিনিস। সেটা কেন খুঁজে পাচ্ছি না? কাল ভোরে এসে দেখতে হবে।' উত্তরে মেজমামা খুক্ খুক্ করে একটু কাশলেন।

বড়মামা খুব নিরীহের মত প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? কতদিন তোকে বারণ করেছি পুকুরে স্নান করিসনি। বড়দের কথা শুনবি না তো!'

মেজমামা বললেন—'ঠাণ্ডা নয়। গলাটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। অনেক মিষ্টি খেলাম তো সারাদিনে।'

ছ'ফুট লম্বা বড়মামা আগে চলেছেন খালি পায়ে। আমরা পেছনে। মেজমামা বললেন, 'নেবে নাকি আমার এক পাটি জুতো? তোমার ডান পায়ে কড়া, আমার বাঁ পায়ে। ভালই হয়েছে। ভাগা-ভাগি করে পরি।'

'দে তাই। বড্ড লাগছে।' বড়মামার করুণ গলা। দু'মামা ভাগা-ভাগি করে জুতো পরলেন। বড়র ডান পায়ে, মেজোর বাঁ পায়ে জুতো।

'তোকে তখনই বলেছিলুম, বলিনি সকালে, বাড়িতে থাক, কথা শুনলি না। শুনে রাখ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মেজমামার উপদেশ শেষ হওয়ামাত্র বড়মামা ফুঁসে উঠলেন, 'যাবার পথে আশুকে আমি দেখে নেবো।'

'থাক, খুব হয়েছে। একবার তো দেখেছ, এখন ক্ষান্তি দাও। সে বেচারা দোকান বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। যাই বল, আশু হল জাত শিল্পী। যেমন রসগোল্লার হাত, তেমনি সন্দেশ। আমাদের পেনেটি গ্রামের গর্ব। হাত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত।'

'রাখ রাখ।' বড়মামা অন্ধকার থেকে উত্তর দিলেন।

'সুধাংশু মুকুজ্জের নাম ক'টা লোক মনে রাখবে? আমাদের আশু ময়রা অমর।'

মনে হল বড়মামার চলার গতি বেড়ে গেল। এক পায়ে জুতো, এক পা খালি। হাঁটাটা তাই অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বড়মামার ডাক্তার এবার মাথায় উঠবে। রুগিরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। পর পর তিনটে ইঞ্জেকশান পড়ার কথা তিনি একটা নিয়ে দিনের দিন আসছেন আর ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। চেম্বারে ডাক্তারবাবু! সেদিন একজন স্পষ্টই বললেন, কুলপুরোহিত আর পরিবারের ডাক্তারকে যদি সময়মতো পাওয়া না যায়, তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হয়।

মেজমামা বললেন, "অ্যাদ্দিন ছিল ডাকসাইটে ডাক্তার, শেষ বয়েসে হয়ে গেল জেলে। কার বরাতে কখন কী যে হয়ে যায়। তাও যদি একটা মাছের মুড়ো পাতে দেখা যেত! এমন নিরামিষ বৈষ্ণব জেলে কমই দেখা যায়!"

যে যাই বলুন, আমার ভীষণ মজা। দিন বেশ কাটছে। বড়মামাকে জন্যেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যখন যা মাথায় ঢোকে তখন তাই করে ফেলেন! কারুর পরোয়া করেন না। ঠিক আমার মতো। লাট্টু বাবু তো সারাদিন লাট্টুই ঘোরাব। অঙ্কে গোল্লা! দুটো দিক তো সঙ্গে সামলান যায় না। সেবার গুলিতে পেয়েছিল। ইতিহাসে

কোনোরকমে টায়ে-টায়ে তিরিশ। মেজমামা রেজাল্ট দেখে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। বড়মামা বললেন, "ব্যাটা আমার সাচ্চা ভাগনে।"

এবারের পরীক্ষায় কী হবে মা সরস্বতীই জানেন! বড়মামা যেভাবে নাচাচ্ছেন, আমি কী করব! গুরুজনের কথা কি অমান্য করা চলে সকলে বলবে, বড় অবাধ্য! উঠোনের এক পাশে মামা-ভাগনে থেবড়ে বসে আছি। ভীষণ কেরামতি চলেছে। দু'পাউণ্ড পিঁপড়ের ডিম দিয়ে চটকান হয়ে গেছে! বিশু রান্নাঘরে কুঁড়ো আর খোল ভাজছে। গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এক বোতল তাড়ি ভীষণ অসুবিধেয় ফেলেছে। গন্ধটা তেমন সুবিধের নয়। নারকেলের মালায় কেঁচো কিলবিল করছে। আস্ত একটা বোলতার চাক ডিম সুদ্ধ খবরের কাগজে শুয়ে আছে। কাগজটা মনে হয় আজকের। কারণ মেজমামা অনেকক্ষণ দোতলায় 'কাগজ কাগজ' করে অস্থির হচ্ছেন। মেজাজ ক্রমশই চড়ছে! মাসীমা শান্ত করার চেষ্টা করছেন; বলছেন "আজকাল কাগজ দিতে খুব দেরি করে। লোডশেডিং হয় তো।"

বড়মামা বললেন, "আমার নাকে রুমালটা বেঁধে দেতো, তাড়ি চালব!"

বিশুদার কুঁড়োভাজা এসে গেছে। গন্ধে আমার জীবেই জল এসে যাচ্ছে, মাছের যে আজ কী অবস্থা হবে! মেজমামা ঠিকই বলেন, ডাক্তারের ভিটামিনযুক্ত টোপ খেয়ে মাছেরা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে। এর পর ডাক্তারকে আর মাছ ধরতে হবে না, মাছেরাই ডাক্তারকে ধরবে।

তারপর শেষ হল। বিশুদা বাইরে থেকে এসে বললে, "একজন রুগি খুব হম্বিতম্বি করছেন, বলছেন, স্ত্রী মরো-মরো, না গেলে ঠেঙাবে।"

বড়মামা বললেন, "ঠেঙাবে কী রে?"

"হ্যাঁ বাবু, ঠেঙাতেও পারে। আজকাল রুগিরা ডাক্তারদের কথায় কথায় ছাখমার করছে।"

"কী হবে বিশে! আমার তো আর দেরি করা চলে না। তুই বরং এক কাজ কর, আমার জামার বুক পকেট থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওকে

দিয়ে বল, ভোলা ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যেতে। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার কী হয়েছে বিশু?"

"আজ্ঞে হার্ট অ্যাটাচ।"

"গর্দভ, অ্যাটাচ নয়, অ্যাটাক।"

বিশু চলে যেতেই বড়মামা বললেন, "নে নে, তৈরি হয়ে নে। মাছের খাবার তো হল, এবার আমাদের সারাদিনের ব্যবস্থা। কুসী, কুসী!

বড়মামা মাসীমার খোঁজে ভেতরে চলে গেলেন।

নটার সাইরেন বাজতে না বাজতেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বড়মামার মাথায় শোলার টুপি। কাঁধে বিলিতি ছিপ। সে ছিপ আবার ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। মটোরবাইকে যাওয়া চলবে না। শব্দে রুগিরা টের পেয়ে যাবেন। ডাক্তার বেশ ভালই আছেন। সাইকেলটা আমাদের বাহন। নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে একবার বড় রাস্তায় পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে! বড়মামার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, আমরা যেন কুখ্যাত আলকাট্রাজ জেল ভেঙে পলাতক দুই আসামী।

পুকুর না বলে দীঘি বলাই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বড়মামা ইজারা নিয়ে বসে আছেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। পাঁচিল-টাঁচিল দিয়ে কোনও দিনই ঘেরা যাবে না, এত বিশাল ব্যাপার! চারপাশে গাছপালা আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তাল, খেজুর, সুপুরি। মেজমামা বলেছিলেন, "জমা নিচ্ছ নাও, তবে মাছ আর আমাদের চোখে দেখতে হবে না, পাবলিকেই ফাঁক করে দেবে।"

বড়মামা বলেছিলেন, "নিজের জন্যে তো অনেক দিন বাঁচা গেল, এবার না-হয় পরের জন্যে কিছু দিন বাঁচি।"

সাইকেল থেকে জিনিসপত্র নেমে এল। শতরঞ্জি, জলের ফ্লাস্ক,

মাছের খাবার, আমাদের খাবার, এক জোড়া ছিপ, জল থেকে মাছ তোলার জাল, একটা রঙবেরঙের ছাতা, মোটা একটা লাঠি, একতাল দড়ি।

আমরা যে-জায়গায় বসব সেই জায়গায় লাঠি পুঁতে ছাতাটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটু ছায়া চাই। চারপাশে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর ডোরাকাটা শতরঞ্জি পড়ল। চারে মাছ না এলেও চোখে ঘুম এসে যাবে। কাল তাই হয়েছিল, একপাশে মামা, আর একপাশে ভাগনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তেঠেঙার ওপর ফড়িং ঝিমোচ্ছে। মাছেদেরও সেই অবস্থা, তাড়ি-চটকা চার খেয়ে বেহুঁশ শুয়ে রইল দিঘির তলায় পাঁকের বিছানায়।

বড়মামা বললেন, "নে চার কর। আমি একটু চা খেয়ে নি। প্রকৃতি যেন হাসছে রে, প্রকৃতি যেন খিলখিল করে হাসছে। কাল থেকে একটা তাকিয়া আনতে হবে।"

"সাইকেলে কি আর তাকিয়া আনা যাবে।"

"খুব যাবে। চীনদেশে সাইকেলে সংসার বয়ে বেড়ায়। সাহস চাই, কায়দা জানা চাই।"

কৌটো খুলে জলে চার ফেলতে লাগলুম। একটা ব্যাঙের তেমন পছন্দ হল না। তিড়িক করে লাফ মেরে জলে চলে গেল। ব্যাঙ ভাল সাঁতার জানে। মাঝ পুকুরে কে ঘাই মারল।

বড়মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন, "আসছে, আজ আমাদের ওইটাই টার্গেট। ঘাই দেখে মনে হচ্ছে কেজি-দশেক হবে। মৃগেল। মাথাটা মেজকে দোব, কী বলিস? কুসীকে ন্যাজাটা। মেয়েরা ন্যাজা খেতে ভালবাসে।"

"আজ পর্যন্ত একটাও তো ধরতে পারলেন না বড়মামা।"

"দাঁড়া। মাছেদের লজ্জা ভাঙুক। মাছেরা একটু লাজুক হয়। তাছাড়া জানিস তো, মনে হিংসে থাকলে জীবজগৎ দূরে সরে যায়। মাছভাজা খাব, মাছভাজা খাব—এই লোভ নিয়ে বসলে, মাছ কেন, একটা ব্যাঙও তোমার চারে আসবে না।"

"তাহলে আজ আমরা আলু-ভাতে খাব, আলু-ভাতে খাব—এই ভাব নিয়ে বসি।"

"কোনো রকম খাবার চিন্তা মাথায় আনবি না। মনে কর আমরা উপবাসী ব্রাহ্মণ কিম্বা রোজা-করা মুসলমান।"

বড়মামা খুব কায়দা করে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছিপ ফেলতে গেলেন। আমডালে বঁড়শি আটকে ছিপ হাতছাড়া হয়ে গেল। হাত-দুয়েক ওপরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ছিপ দুলছে। হুইলটা তো কম ভারী নয়!

আমাদের হাইজাম্পের মহড়া চলছে। নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, দু'হাত তুলে মারো লাফ। আমপাতা, আমডাল, সবসুদ্ধ নিয়ে ছিপ আবার ফিরে এল মালিকের হাতে।

বড়মামা বললেন, "বড় শুভ লক্ষণ। আম্রপল্লব শিকার করে উদ্বোধন। এবার যখন ছিপ ফেলব, তুই তখন মাথার দিকটা একটু সামলে দিস তো। আকাশের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই।"

"তাহলে আপনি একটু বাঁ পাশে সরে আসুন। মাথার ওপর এক-গাদা ডালপালা ঝুলছে। আবার আটকে যাবে।"

বড়মামা সরে আসতে আসতেবললেন, "গাছের স্বাধীনতা আকাশে।"

ঘুরিয়ে ছিপ ফেললেন। এবার বেশ ফেলেছেন। সুতোয় টান মেরে ফাতনাটা সোজা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং এসে বসে পড়ল।

বড়মামা আয়েস করে বসে পড়লেন, "নে আয়, এবার স্যাণ্ডউইচ খাওয়া যাক।"

"এর মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করবেন? সারাটা দিন পড়ে আছে।

থাক না, এটা তো টেষ্ট কেস। কুসী কেমন করেছে দেখতে হবে না! চোখের দেখা নয়, চেখে দেখা। বুঝলি, আমি ভাবছি।"

"কী ভাবছেন বড়মামা?"

"এই মাছধরা আর রুগি-দেখাটা একসঙ্গে চালালে কেমন হয়, রথ দেখা আর কলা বেচার মতো।"

"তাহলে এই দিদিটাকে তো চেম্বারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।"

"ধ্যার বোকা! চেম্বারটাকে এখানে তুলে আনব। ঘর বানাব না, একটা সাদা তাঁবু খাটাব। কিছু রোজগারও তো চাই। এই ছাখ না, কখন মাছ ঠোকরাবে কেউ জানে না। তুই চোখ রাখলি ফাতনার দিকে, আমি দেখতে লাগলুম রুগি।"

"আমি আবার অঙ্কও কষতে পারি।"

"ওঃ, তাহলে তুই মেঘনাদ বধ হয়ে যাবি রে!"

"আজ্ঞে মেঘনাদ সাহা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আমার প্রায়ই গুলিয়ে যায়। নে, স্যাণ্ডউইচ নে, তাড়াতাড়িতে বেশ ভালই বানিয়েছে। আজকে ওই বড় মাছটা পাবই। ওটা পেলে, কাল মাছের পুর দিয়ে কচুরি করিয়ে আনব। মাছ ধরার কম ধকল! রোগা না হয়ে যাস।"

বড়রা প্রায়ই বলেন, দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না। এ দেখছি মাছ ধরার দুপুরও সহজে সন্ধে হতে চায় না। বড়মামা মাঝে মাঝে বঁড়শি তুলে বলছেন' যাঃ টোপ খেয়ে গেছে। নে কৌটোটা খোল। টোপ দে। এবার একটু কেঁচো দে। এবার একটু বোলতার ডিম ছাড়। মাছেদেরও মুখ আছে। মাঝে মাঝে মুখ পালটে দিতে হয়।

গরমের দুপুরের ঝিম ধরেছে। জল থেকে একটা গরম-ঠাণ্ডা তাপ উঠছে। মাঝে-মাঝে পানকৌড়ি ছোঁ মেরে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওপারে গোটাকতক হাঁস প্যাঁকোর-প্যাঁকোর করছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। ঘুম চোখে জড়িয়ে এল।

হুইলের ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলুম। বিরাট মাছ পড়েছে। যাক, এতদিনে বড়মামার হাতযশ দেখা গেল। মেজমামা এবার কাত। উত্তেজনায় বড়মামার চোখ বড়-বড়। মাছ যে ভাবে সুতো টানছে, হুইল শেষ হয়ে এল বলে।

পুকুরের দিকে তাকালুম। এ কী, জল স্থির। মাছ তো জলেই খেলবে! বড়মামার ছিপ কোথায়! ছিপ এরিয়েলের মতো শূন্যে খাড়া। পিঠের দিকে রেঁকে আছে ধনুকের মতো। মাছ কি তাহলে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ছুটছে। কী মাছ রে বাবা!

মাঠের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির।

"ও বড়মামা, আপনি কী ধরেছেন ?"

"কেন, মাছ !"

"মাছ তো আপনার পেছন দিকে মাঠ ভেঙে ছুটছে।"

"সে কী রে ? মেঠো মাছ নাকি ?"

"আজ্ঞে না, একটা দামড়া গোরু।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক টানে ছিপটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গোরু ছুটছে, ছিপ ছুটছে আমরা ছুটছি।

সন্ধে হয়-হয়, আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। দেখার মতো চেহারা হয়েছে আমাদের। লোকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে, আমরা ফিরলুম গোরু ধরে। গোরু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। গোরুর মালিকও আছেন। বঁড়শি কেটে বসে গেছে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে।

মেজমামা বললেন, "কী কায়দায় এমন করলে !"

বড়মামা বললেন, "ফাতনাটা নড়তেই মেরেছি টান। গোরুটা মনে হয় পেছনে চরে বেড়াচ্ছিল। বঁড়শি গেঁথে গেল পিঠে। গোমুখ্য মেরেছে ছুট। যত ছোটে, বঁড়শি তত পিঠে ঢোকে। বিশে, বিশে।"

বড়মামার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

গোরু ধরে বড়মামার আবার সুমতি ফিরে এল। রুগিরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। সকলেই বলাবলি করছেন এ আমাদের সেই পুরনো মুকুজ্যে-ডাক্তার, যাকে যমেও ভয় পায়।

যমে ভয় পেলে কী হয়, বড় দুঃখু, মাছে ভয় পায় না।

— —

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল

পূজোর ছুটি পড়ে গেল। কি মজা! হাফইয়ারলিতে মোটামুটি ভাল ফলই হয়েছে। অঙ্কে একশো পাওয়াই উচিত ছিল। দু নম্বর কাটা গেছে। বাবা বললেন,

'অপমান তোমার নয় অপমান আমার। আমি নিজে কোনও পরীক্ষায় একশোর কম পাইনি। আধটা নম্বরও কেটে নেবার সুযোগ কাউকে দিই নি। আমার ছেলে হয়ে তুমি দু দুটো নম্বর জলে ফেলে এলে। কতবার বলেছি, রিভাইস, অ্যাণ্ড রিভাইস, রিভাইস করবে। এক জায়গায় চুপ করে পাঁচ মিনিট বসতেই পার না ত কি হবে!'

টেবিলের তলায় যে উঁচু কাঠ থাকে সেই কাঠের ওপর পা রেখে আঙুলে আঙুলে প্যাঁচ খেলছিলুম। আঙ্গুলে আঙ্গুলে লড়াই। টেবিলে বসে থাকলে মানুষের ওপর দিকটাই কথা বলে হাত নেড়ে। কলম বাগিয়ে লেখে। নিচের দিকটার ত কিছুই করার থাকে না। বড়রা দেখেছি পা নাচান। পা নাচালে টেবিল নাচে। বড়দের নাচনে টেবিল নাচলে দোষের হয় না। বকুনি খেতে হয় না। ছোটরা নাচালে রক্ষে নেই। গম্ভীর মুখ বলে উঠবেন, সিলি, অসভ্য, জানোয়ার। আমি জানি বলেই পা নাচাইনি। দুপায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়াজড়ি করে লড়াই করাচ্ছিলুম। হঠাৎ পা শ্লিপ করে মেঝেতে পড়ে গেল দুম করে। টেবিলটা কেঁপে উঠল!

বাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন, 'পাঁচটা মিনিট তোমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। সামান্য ব্যাপার। আকাশের চাঁদ ধরতে বলছি

না, গরম জলে পা ডুবিয়ে বসতে বলছি না, সন্ন্যাসীদের মত পেরেকের বিছানায় শুতে বলছি না। বলেছি, গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু স্থির হয়ে বসতে শেখ, দ্যাট ইজ ভদ্রতা। পড়াশোনা করার সময় একটু মনোযোগী হও, পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যাই ভাবটা ছাড়। কে কার কথা শোনে? চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। হ্যাবিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার অফ ম্যান।'

কিছু দূরে ইজিচেয়ারে দাদু। মুখের সামনে দুপাশে ছড়ান স্টেটস-ম্যান কাগজ। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে কাগজের হাত পা বেরিয়েছে। ধুতি পরে চেয়ারে আধশোয়া। পায়ের ওপর পা? টুক-টুক করে চটি নাচছে। মুখটা কাগজে তুবড়ে আছে। পেছন থেকে দেখছি বলেই দাদুর মাথা দেখছি। আইনষ্টাইনের মত এক মাথা সাদা ধবধবে চুল। চোখে নিকেল ফ্রেমের গোল চশমার পুরু কাঁচ। কাগজের আড়াল থেকে দাদু বললেন, 'ছেলেটাকে তখন থেকে খুব দাবড়াচ্ছ দেখছি! ব্যাপারটা কি? খুব গুরুতর কিছু করে ফেলেছে না কি?'

বাবা বললেন, 'অঙ্কে প্রেসাস দুটো নম্বর নিজের ছটফটানির জন্যে খুইয়ে এল। একবার ভেবে দেখুন দু দুটো নম্বর!'

কাগজ কথা বলে উঠল—'কত পেয়েছে?'

'নাইনটি এইট, আটানব্বই।'

'বল কি? আটানব্বই। আমি একবার ষাঠ পেয়েছিলুম, আমার ফাদার, তুমি তাঁকে দেখনি, সারা গ্রামের লোককে ডেকে এনে পেটপুরে লুচি বোঁদে দই খাইয়েছিলেন। তাঁর ফাদার মানে আমার গ্র্যাণ্ডফাদার এক রাত যাত্রা দিয়েছিলেন, হাটতলায় বাজি পোড়ান হয়েছিল। আর তুমি আটানব্বই পাওয়া ছেলেকে গালাগাল দিচ্ছ!'

'আপনি ছিলেন আর্টসের ছাত্র। ইংরাজীতে, ইতিহাসে, বাংলায়, সংস্কৃতে লেটার মার্কস পেয়েছিলেন। অঙ্কে ষাট ত খুব ভাল নম্বর।'

'আরে দ্যাৎ, সে ত ওই একবারই পেয়েছিলুম। তার আগে ত ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ। চল্লিশ কখনও পেরোতে দিই নি। ষাট পেলুম অঙ্ককেও

বিদায় জানালুম ! ষাট দিয়ে শেষ। কলেজে ঢুকেই কালিদাস, শেক্স-পীয়ার যত মনের মত মানুষ পেয়ে গেলুম। মোক্ষমূলারকে দেখে দাড়ি রাখতে শিখলুম। সেই দাড়িই বাড়তে বাড়তে আজ বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে।

দাদু আবার কাগজে মুখে জড়াজড়ি করে সম্পাদকীয়তে ডুবে গেলেন। এখন বেশ কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না।

বাবা এতক্ষণ দাদুকে নিয়ে পড়েছিলেন। আবার আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন, 'ধৈর্যই সাফল্যের মূলে। তোমার অঙ্কে মাথা খুব খারাপ নয়। অভাব হল ধৈর্যের। ধৈর্য বাড়াতে হবে। কিন্তু ধৈর্য কিসে বাড়বে!' ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন বাবা। আমার জানা নেই, ধৈর্য কিসে বাড়ে।

দাদুর সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। বাবা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ধৈর্য কিসে বাড়ে আপনার জানা আছে বাবা ?'

দাদু কাগজে ডুবে আছেন। মনে হয় সেই সম্পাদকীয়তে। কাগজে নাকি ওই একটাই পাতা। ওই পাতাটা না পড়লে কিছুই জানা যায় না। কাগজ দাদুর গলায় কথা বলে উঠলেন,

'কিসের ধৈর্য ?'

'মানুষের ধৈর্য।'

'দুঃখ কষ্টে ধৈর্য বাড়ে বলে শুনেছি। আর ওই ত কবিতাতেই আছে,

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ, বাঁধ বুক শত দুঃখ, শত জ্বালা আসিবে আসুক।'

দাদু কথাকটা কোনও রকমে বলেই চেয়ারে খচর-মচর খচর-মচর করে কাগজ টাগজ সমেত আর একপাশে কাত হয়ে গেলেন। কাগজ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। বাবা আবার ব্যস্ত আমার দুটো নম্বর কম পাওয়া নিয়ে।

'কি করে ওর দুঃখ কষ্ট হবে !'

'দিলেই হবে।'

মুখ দেখে মনে হল বাবা খুব বিপদে পড়েছেন। টাকা দিকে টাকা হয়। জ্ঞান দিলে জ্ঞান হয়। কি দিলে দুঃখ হয়! বাবা কি করে জানবেন। আমি জানি আমার কিসে দুঃখ! বলব না কি সাহস করে! না বাবা, বললে আমারই বিপদ।

আমাকে পড়তে বসালে ভীষণ দুঃখ হয়। বিকেলের খেলা বন্ধ হলে খুব কষ্ট হয়। রোজ রাতে কোঁত কোঁত করে এক গ্লাস দুধ খাওয়া ভীষণ দুঃখের। মা আমাকে একা রেখে কোথাও বেড়াতে গেলে ভীষণ দুঃখের। পূজোর সময় নতুন জামা-কাপড় না হলে ভীষণ দুঃখের। রাগ করে আমার সঙ্গে কেউ কথা বন্ধ করে দিলে ভীষণ দুঃখের। সকালে মেঘলা থাকলে ভীষণ দুঃখের। আমার বই নিয়ে নিলে ছিঁড়ে দিলে, দাগ কেটে দিলে খুব দুঃখের। গাছে ঘুড়ি আটকে গেলে খুব দুঃখের। আরও অনেক অনেক দুঃখ পাবার ব্যাপার আছে। আর কষ্ট!

কত রকমের কষ্ট আছে। দাঁতের যন্ত্রণা। প্রায়ই হয়। মা বলেন হুতু কি ভরে রাখ। পেয়ারা পাতা চিবো। মাঝে মাঝে রাতের দিকে যখন ভীষণ বাড়ে, বাবা অফিস থেকে এসে তুলোয় লবঙ্গর তেল লাগিয়ে দাঁতের ফুটোয় চেপে ধরে যখন রাগ রাগ গলায় বলেন, বাঙালী দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। সারা জীবন খেতে হলে দুবেলা দাঁত মাজতে হয়, এই সামান্য জ্ঞানটা বাঙালীর ছেলের হল না, তখন কষ্টের ওপর আরও কষ্ট হয়। সায়েবদের ছেলেদের মত নাকি ছেলে হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লেখাপড়ায় ভাল, দুবেলা দাঁত মাজে। রাতে শোবার আগে দাঁত মাজবেই। ভূমিকম্প হচ্ছে বাড়ি ভেঙে পড়বে, হিটলারের উড়ো রোম ভি-টু এসে আগুন ছারখার করে দিচ্ছে। নিয়ম ইজ নিয়ম। সায়েব বাচ্চা ওয়াশ বেসিনে দাঁড়িয়ে রাতের দাঁত মাজছে। চন্দ্র সূর্য ঘুরে যাবে তবু সায়েবের নিয়ম পালটাবে না। আমার চেয়ে কেউ ভাল, এ কথা শুনলেও কষ্ট হয়! তবে আনন্দ হয়, দাদু যখন বাবার কথা না মেনে বলেন,

'তুমি আর সায়েবদের গুনগান কোর না। সায়েবদের মত খারাপ

দাঁত পৃথিবীতে তুমি খুব কম জন্তুরই পাবে। যৌবনেই বত্রিশ পাটি ফেলে দিয়ে ফোকলা মানিক।'

দাঁতের কষ্ট ছাড়াও আরও কত কষ্ট আছে। খুব তেলেভাজা খেলে পেট ব্যথা করে। খেলার মাঠে তলপেটে বল লেগে ভীষণ কষ্ট হয়। চোখে বালি পড়লে কষ্ট হয়। স্কুলে হেড স্যার যখন মাথায় ডাস্টার পেটা করেন তখন খুব কষ্ট হয়। বাবা যখন বেড়াতে বের করে মাইলের পর মাইল হাঁটান তখন খুব কষ্ট হয়। কিছু কষ্ট আপনা থেকেই হয়। কিছু কষ্ট দেওয়া হয়। আমাকে দুঃখ কষ্ট দেবার জন্যে বাবাকে ভীষণ চিন্তিত দেখলাম।

বাবা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে যখন দেখলেন উপায় বেরোচ্ছে না, তখন আবার দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন', 'কি করে ওকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া যাবে।'

দাদু এবার কাগজটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। চশমাটা চোখ থেকে খুলে পাশের টেবিলে রাখলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বাবার দিকে তাকালেন।

'আপনি বললেন দুঃখে কষ্টে থাকলে মানুষের ধৈর্য বাড়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ত, ভুল কি বলেছি! খাঁটি কথা!'

'না না, ভুল বলবেন কেন? আমি সেকথা একবারও বলিনি। আমি বলছি—।'

'তুমি যাই বল, দুঃখে না থাকলে মানুষ বড় হয় না। আর বড় সেই হয় যার ধৈর্য আছে। তার মানে দুঃখে ধৈর্য বাড়ে। আমার যা বিশ্বাস, আমি যা দেখেছি তাই বললুম। তোমার যদি অন্য কোন রকম ধারণা থাকে, থাক। আমি আমার ধারণা নিয়ে বসে রইলুম গ্যাঁট হয়ে। নড়বও না চড়বও না।'

আমার দাদুর বয়স হয়েছে ত। মা বলেন বয়স হলে মানুষ ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সত্যিই তাই। দাদু এক ভাবছেন, বাবা এক বলছেন। দাদু যা বলছেন বাবাও তাই বলছেন,। কিন্তু দাদু ভাবছেন, বাবা অন্যরকম বলছেন! বেশ মজা কিন্তু।

দাদুর সঙ্গে বাবার যখন এই রকম ভুল বোঝাবুঝি হতে থাকে, বাবা তখন চুপ করে যান। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলে উত্তেজনা কমে আসে। সেই সময় আবার নতুন করে বেশ বুঝিয়ে বললে দাদু আবার ঠিক রাস্তায় চলতে থাকেন।

পাঁচ মিনিট দুজনেই চুপচাপ। কারুর মুখেই কথা নেই। খবরের কাগজ মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিঠের ওপর জাহাজের ছবি। টেবিলের তলায় আমার চটি জোড়া। ডানটার সঙ্গে বাঁটার লড়ালড়ি শুরু করিয়ে দিয়েছি। একটা পাটি মনে করছি আমি তার একটা পাটি আমাদের ক্লাসের হোঁতকা মদন। মদনাকে আজ হারাবই। খুব কসরত চলছে পায়ে পায়ে। ভুলেই গেছি সামনে বাবা। জানালার পাশে ইজি চেয়ারে দাদু। এইবার মদনা। মুখ থুবড়ে ধপাস। খুব জোর শব্দ হয়েছে। নিজেই চমকে উঠেছি। বাবা ত উঠবেনই।

'কি করলে ? তুমি দেখছি টেবিলের নিচের কাঠটা না ভেঙে ছাড়বে না। ভাঙলে নাকি !'

'আজ্ঞে না ? কাঠ নয় চটি।'

'সহ্য হচ্ছে না বুঝি পায়ে। অসুবিধে হলে অসভ্যতা না করে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।'

দাদু সুখ শব্দটাই কেবল শুনতে পেয়েছেন। তিনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন,

'ইয়েস সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল। সুখে মানুষ অলস হয়ে যায়। নানা রকম পাপ এসে জড়িয়ে ধরে। ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে।'

'দুঃখ কি ভাবে আসে ?'

'দুঃখ আসে সুখের পথ ধরে।'

'সে আবার কি ?

'যে আকাশে রোদ সেই আকাশেই বৃষ্টি। এই আমার জীবনটাই দেখনা। জন্মে ছিলুম বড় পরিবারে। বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, দাদা, দিদা জুড়িগাড়ি, ল্যাণ্ডো জন্মদিন, বাজি বাজনা। সব একে একে

চলে গেল। এসে পড়লুম কলকাতার মেসে। ছেলেপড়াই আর পড়ি। ভুট্টা খাই। কলকাতার কলের জল। কেউ কোথাও নেই। আমি আর আমার জীবন। কত দুঃখ। সুখ থেকে দুঃখে। সেই দুঃখের সঙ্গে লড়তে লড়তে, জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে আবার সব ফিরে এল। যারা চলে গেলেন তাঁরা আর এলেন না। সুখ এল অন্যভাবে, অন্য মূর্তি ধরে। সুখের পথে দুঃখ এল, দুঃখের পথে সুখ। মাঝখান থেকে কি হল আমার চরিত্রটা তৈরী হয়ে গেল। এখন আমার কাছে সুখও যা দুঃখও তাই। দুইই সমান।'

'তা হলে এখন আমার মৃত্যুই ভাল।'

'সে আবার কি?' দাদু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সারা ঘরে বার কতক পায়চারি করে এলেন। দুজনের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে বসে আছি। আমার চটি দুপাটি যেটার নাম মদনা সেটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মদনা ফ্ল্যাট অন দি গ্রাউণ্ড। দাদু হঠাৎ বাবার সামনে থেমে পরে বললেন,

'তুমি দুটো মাত্র নম্বরের জন্যে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছ হে।'

'বলেন কি, দুটো নম্বরের কোনও ভ্যালু নেই?'

'পরের পরীক্ষায় ঠিক করে নেবে। ফুল মার্কস নিয়ে আসবে। ছেলে ত ভাল। মাথা আছে, একথাও তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

'মাথা আছে বলেই ত আমার এত দুঃখ। মাথা না থাকলে, গবেট হলে আমার কিছু বলার ছিলনা। আসলে ওর ধৈর্য নেই। অসম্ভব ছটফটে। একজায়গায় চুপ করে ভদ্রভাবে কিছুক্ষণ বসতে পারে না।'

'কেন?' এইতো বেশ বসে আছে চুপ করে তখন থেকে।'

'চুপ করে!' বাবা একটু দুঃখের হাসি হাসলেন। 'টেবিলের তলায় দুটো ঠ্যাং নিয়ে তখন থেকে ঝটাপটি চলেছে। সব সময়েই মনে খেলা চলেছে। মনটা খেলার মাঠ হয়ে গেলে অঙ্ক আসবে কোথা থেকে! অঙ্ক ত আর ফুটবল নয়।

দাদু নিচু হয়ে টেবিলের তলাটা দেখে নিয়ে বললেন,

'দুটো পাই অবশ্য এখন স্থির হয়ে আছে। তবে এক পাটি চটি উলটে আছে। তবে মানে ফ্রন্ট এখন শান্ত হলেও আগে লড়াই চলছিল।'

মনে মনে বললুম, 'দাদু ওটা মদনা। মদনাকে উলটে রেখেছি। পরশুদিন ক্লাসে আমাকে ঠেঙিয়েছিল। আজ তার প্রতিশোধ নিয়েছি।'

বাবা বললেন, টেমপরারি সিস ফায়ার। আবার এখুনি শুরু হল বলে।'

'চটি জিনিসটার তেমন গাম্ভীর্য নেই হে। বড় চপল, বড়ই চটুল। চপল পায়ে আরও, ওকে তোমরা বুটজুতো আর মোজা পরাও। তহলে চটফটানি যদি একটু কমে! দাদু আমার চোখে চোখ রেখে হাসলেন। বুঝলুম বলতে চাইছেন, 'আজ কেমন হচ্ছে যে।'

ঘরে এতক্ষণ আমি, বাবা আর দাদু ছিলুম। হঠাৎ মা এসে ঢুকলেন। হাতে একটা ভাঙা ফুলদানি। এই সেরেছে। একেই বোধ হয় বাবা বলেন, গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। দুপুরবেলা ঘরের টেবিলে বসে কাচের উপরে গোটাকতক পয়সা রেখে ক্যারাম খেলছিলুম। ট্যানজেন্ট মারটা ভাল করে শিখতে হবে। এক মারে চারটে ঘুটি ক্যারামবোর্ডের চার পকেটে যতদিন ফেলতে না শিখছি ততদিন শান্তি নেই। সেই নেট প্র্যাকটিসের সময় একটা আধুলি ছিটকে গিয়ে ফিনফিনে ফুলদানিতে লেগেছিল। জলও ছিল না, ফুলও ছিল না। ফুলদানিটা ফ্যাঁস করে ফেঁসে গেল। কি ফুলদানিরে বাবা, আধুলির ধাক্কা সহ্য করতে পারে না। সেদিন বাথরুমের দেয়ালে ঘষা লেগে গা ছড়ে গেল, মা বললে, তোর কি গারে! ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাস! এমন ফুলদানি রাখা কেন যা আধুলির ঘায়ে টসকে যায়। ভাঙা লদানিটা সাবধানে ঘুরিয়ে রেখে এসেছিলুম।

মা ফুলদানিটা বাবাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

'এটা কে ভাঙল?'

বাবা চমকে উঠেছেন। বিলেত থেকে আনা জিনিস। ভেঙে ফেলে

আমিও মনে মনে দুঃখিত। তবে সাহস করে বলতে পারব না, আমি ভেঙেছি। বাবা ভাল করে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন,

'একি সর্বনাশ। কে ভাঙলে, এমন সুন্দর জিনিসটা। এতো মনে হচ্ছে ঠুকরে ভাঙা। আমার টেবিলে পাখিটাখি এসে বসে নাকি? তুমি কি টিয়া পুষেছ!

'কই না ত!'

'তা হলে আর কি হতে পারে। উল বোনার কাঁটা। তোমার বোনার কাঁটা কি আমার টেবিলে ছড়িয়ে রেখেছ!'

'এখন আবার উল কি! সে ত শীতের মুখোমুখি সময়ে। এখনও অনেক দেরি।'

নিজেকে ভীষণ কাপুরুষ মনে হচ্ছে। বাবার প্রিয় ফুলদানি ভেঙে ঘাপটি মেরে বসে আছি। মা খুঁজছে অপরাধীকে। বাবা শার্লক হোমসের মত একের পর এক বলে যাচ্ছেন, পাখি, উলের কাঁটা। পাখিকে সন্দেহ করছেন, মাকে সন্দেহ করেছেন। আমাকে কিন্তু করেন নি। না করলেও বলে দেওয়াই ভাল। অবশ্য বাবার ডিটেকটিভ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি ভেঙেছ? আমি মিথ্যে বলে অস্বীকার করতে পারি। মিথ্যে কথা। দু একবার বলে দেখেছি। খুব খারাপ লাগে। ছোট মনে হয়। কষ্ট হয় মনে। অপরাধ স্বীকার করলে বকুনি হবে। বকুনি খেলে কষ্ট হবে। দাদু বললেন কষ্ট পেলে মানুষ বড় হয়।

গম্ভীর মুখে বললুম, 'আমি ভেঙে ফেলেছি।'

মা বোধহয় চিৎকার করতে চাইছিল। মা যেমন করে। একটু কিছু হলেই চিৎকার, হইহই। কেন করলি। অসভ্য ছেলে। বাবা মাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

'তুমি ভাঙলে? কেন ভাঙলে?'

আমি মাথা নিচু করে বললুম, 'খেলতে খেলতে। ইচ্ছে করে ভাঙিনি।'

,কি খেলা? ঘরে বল খেলছিলে, না গুলি, না বন্দুক' ছুঁড়ে যেভাবে বেলুন ফাটায় সেইভাবে ফুলদানিতে টিপ প্র্যাকটিস করছিলে!'

'না, টেবিলের কাঁচে সিকি, আধুলি, দশপয়সা, পাঁচপয়সা ছড়িয়ে একটা আধুলিকে স্ট্রাইকার করে ক্যারাম খেলছিলুম। হঠাৎ আধুলিটা ছিটকে গিয়ে ফুলদানিতে লাগল আর পুট করে ফুটো হয়ে গেল!'

বাবা দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছেন! সেই ছটফটানি। সেই ধৈর্যের অভাব। নিজের ক্ষতি, সংসারের ক্ষতি, দেশের দশের ক্ষতি।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েদের শুনেছি খুব ধৈর্য। ধৈর্য কি করে হয় বলতে পার?'

মা বললেন, 'রেশনের চাল থেকে কাঁকর বাছলে আর বসে বসে বেলকুঁড়ির গোড়ের মালা গাঁথলে।'

দাদু যোগ করলেন, 'মশারির ভেতর মশা মারার চেষ্টা করলে আর উকুন বাছলে। পাকা চুল তুললেও হতে পারে। অবশ্য লোভ দেখাতে হবে, পয়সায় একটা পাকা চুল।

আমাদের হরিদা কখন ঘরে এসেছে আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। কাঁচাপাকা চুল। কাঁধে ঝাড়ন। হরিদা বললে, 'মাছ ধরলেও খুব ধৈর্য বাড়ে। সবচেয়ে বেশি বাড়ে! সারাদিন পুকুরপাড়ে ফাতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কেমন বসে থাকে দেখেন নি। যেন এক ঠ্যাঙে বক দাঁড়িয়ে আছে মাছের আশায়।' কথা কটা বলেই হরিদা টেবিল থেকে কাপ ডিশ তুলে নিয়ে আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

বাবা নিজের হাঁটুতে দু'বার চাপড় মেরে বললেন, 'ঠিক হ্যায়। ওকে আমি প্রতি রবিবার মাছ ধরতে নিয়ে যাব, সিধু জ্যাঠার পুকুরে। হরি ঠিকই বলেছে। হি ইজ এ জিনিয়াস।'

মা বললেন, 'চাল বাছাটাই ধরুক না। চোখে ভাল দেখতে পাই না। ভীষণ কাঁকর। তোমার বাবার দাঁতে লাগলে বিরক্ত হন।

হরিও আজকাল সময় পায় না। বাড়ির বাইরেও যেতে হচ্ছে না। দাওয়ায় বসে বসে রোজ সের দুয়েক চাল বাছলেই ধৈর্য বেড়ে যাবে।'

দাদু বললেন, 'ওর চেয়ে নরম, লাভলি আর একটা কাজও তোমরা বললে। রোজ ভোরে উষার আলোতে ও আমার জন্যে যুঁইফুলের মালা গাঁথুক না। দেবতার কাজ। মন পবিত্র হবে। স্বাস্থ্য ভাল হবে।

বাবা বললেন ভেবে দেখি। আমি মুক্তি পেলুম তখনকার মত দরজার বাইরে একটা কাগজের গোল্লা পড়েছিল। সেটাকে ডানপা, বাঁপা, বাঁপা, ডানপা করতে করতে রান্নাঘরের দরজাটাকে গোল পোস্ট ভেবে এক শট। সামনেই দুধের ডেকচি। কাগজের গোল্লা সোজা সেই দুধপুকুরে! পালাই বাবা।

সমাপ্ত